ফিলিস্তিন ও হামাস

এক রক্তাক্ত উপাখ্যান

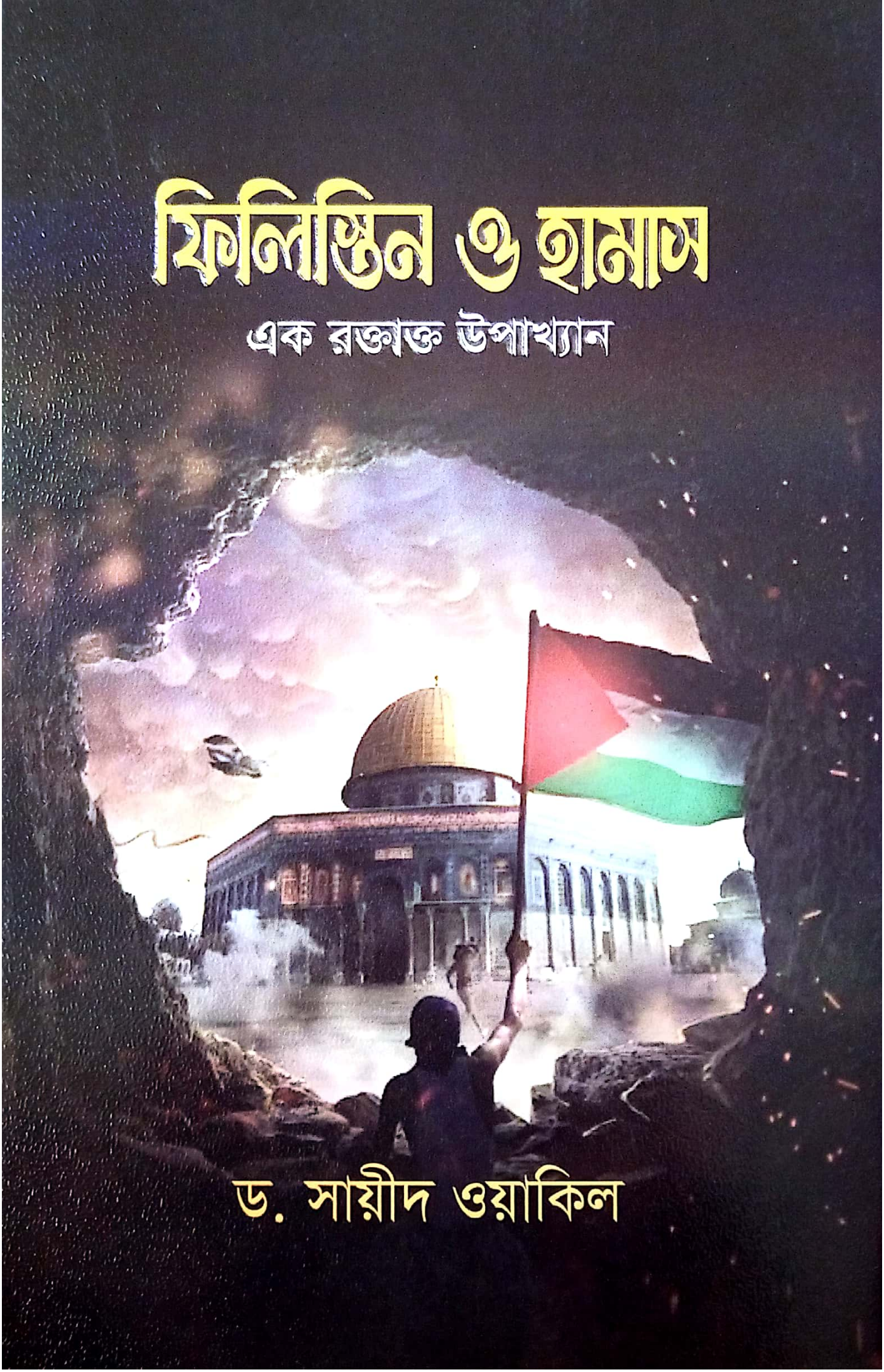

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

ভূমিকা ০৭

অধ্যায় এক
ফিলিস্তিনি: এক দুঃসাহসিক জাতির গল্প ০৯

অধ্যায় দুই
কেনান : ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে বনী ইসরাইলের আগমন ১৩

অধ্যায় তিন
দেশহীন-গোত্রহীন : পৃথিবীর পথে পথে ১৯

অধ্যায় চার
ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে মুসলিম আধিপত্য ২৩

অধ্যায় পাঁচ
ক্রুসেড : জেরুজালেমে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ৩১

গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবীর উত্থান ৩৪

ক্রুসেডারদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার গল্প ৩৫

অধ্যায় ছয়
উসমানীয় সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন ৩৭

অধ্যায় সাত
ইহুদি জাতির একটা রাষ্ট্র দরকার ৪৩

অধ্যায় আট
জায়নিস্ট মুভমেন্ট : পুণ্যভূমিতে আলেয়ার ঢেউ ৫১

Scanned by CamScanner

অধ্যায় নয়
অবিমৃশ্যকারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এবং
মুসলিম ভূ-খণ্ডে ইসরায়েলের জন্ম ৫৭

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদানকারী মুসলিম দেশসমূহ ৬১

অধ্যায় দশ
জায়নবাদী আগ্রাসন ও সম্মিলিত প্রতিরোধ : পরাজয়ই যেখানে
ললাট-লিখন ৬৫

আল কুদস্ দিবস ৬৭

অধ্যায় এগারো
ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিএলও-ফাতাহ্ ৬৯

অধ্যায় বারো
প্রতিরোধ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : মুক্তিকামী হামাস ৭৭

হামাসের জন্মকথা ৮০

জর্ডান থেকে হামাসের কার্যক্রম পরিচালনা ৮৯

আল-কাসসাম ব্রিগেড গঠন ৯০

আল কাসসাম ব্রিগেডের আত্মঘাতি স্কোয়াড ৯১

হামাসের অপারেশন ৯২

অধ্যায় তেরো
স্বাধীনতাকামী দুই সংগঠন : হামাস-ফাতাহ্ দ্বন্দ্ব ৯৩

অধ্যায় চৌদ্দ
হামাসেই আস্থা : মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের ৯৯

ইসমাইল হানিয়ার সরকার গঠন ১০২

হামাস সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক ১০৫

হামাস সরকারের চ্যালেঞ্জ ১০৭

ফিলিস্তিনিদের পাশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ১০৭

Scanned by CamScanner

অধ্যায় পনেরো

মোসাদের হামাস নেতৃবৃন্দ হত্যার মিশন ১১১

মোসাদ কেন খালিদ মিশালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল? ১১৩

অধ্যায় ষোলো

গাজা : মানবতাহীন বিশ্বের এক উন্মুক্ত গুয়ান্তানামো বে কারাগার ১১৫

গাজার ঘরে ঘরে খানসা আর ফাদি আবু সালাহ ১১৯

শেষ অধ্যায়

অপেক্ষা : কোথায় শেষ হবে এই অন্তহীন সংঘাত ১২১

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

ফিলিস্তিনি সমস্যা বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন একটি 'মানবিক সমস্যা'। মাঝে মাঝে ভাবি- ফিলিস্তিনিরা কি মানব জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? না কি আমরা মানব জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? নিজ মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা উদ্বাস্তু, তারা সন্ত্রাসী এবং তারাই মৌলবাদী জনগোষ্ঠী। অথচ দখলদার জারজ ইহুদি রাষ্ট্রটি যেন বিশ্বের সকল আইনের উর্ধ্বে; তাকে রুখতে পারে-এমন কোনো শক্তি বিশ্বে জন্মায়নি। তারা যা ইচ্ছে করতে পারে; সবকিছু করার তাদের অধিকার আছে; এমনকি পুরো ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড থেকে সকল ফিলিস্তিনিকে হত্যার লাইসেন্সও তাদের আছে। এ কেমন বিশ্বব্যবস্থা! এ কেমন মানবতা!

হয়তো গতকালও শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, আর না (যদিও আমার ভাবনার কোনো দাম নেই)! এভাবে ফিলিস্তিনি মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া আর না। বিবেকহীন বিশ্বের মুখে লাথি মেরে জারজ রাষ্ট্রটির কাছে সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্তত মানুষ হয়ে দু'দিনের পৃথিবীতে একটু শান্তির নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে ওরা। জীবনকে এত দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়ে কী সুখ আমরা পেতে যাচ্ছি! আর জালিম ইসরায়েলিদের নিকট থেকে কি ক্ষমতালোভী অবিমৃশ্যকারী বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনিদের মুক্তির কোনো বার্তা শোনাতে পারবে?

হতাশাগ্রস্ত মনে যেন আলোর ঝলকানি দিয়ে উঠেছে 'হামাস'। মনে হচ্ছে ওরা পারবে। ওরা পারবে হিংস্র জায়োনিস্টদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে।

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

Scanned by CamScanner

অধ্যায় এক

ফিলিস্তিনি : এক দুঃসাহসিক জাতির গল্প

বিশ্বের প্রাচীন মানচিত্রে ফিলিস্তিন নামক কোনো স্বতন্ত্র দেশের অস্তিত্ব ছিল না। কেনান, কানান, কানআন, কিনআন, জায়ন, ইসরাইলের ভূমি, দক্ষিণ সিরিয়া, জুন্দ ফিলাস্তিন, পবিত্র ভূমি প্রভৃতি নামে দেশটি পরিচিত। তাছাড়া জুহাদ, জুদিয়া, প্রতিশ্রুতি ভূমি, ইসরাইল, প্যালেসতিনা, বিলাদ আল-শামস, প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন), গ্রেটার সিরিয়া, কোয়েলে সিরিয়া, পুণ্যভূমিসহ অনেক নামই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, মুসলমানগণ সতেরোটি এবং ইহুদিরা এটাকে সত্তরটি নামে ডেকে থাকে (তবে এর সীমানার ব্যাপারে মতভেদ আছে)। এটি ছিল মূলত সিরিয়ার অংশ। বর্তমানের ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইন মধ্যপ্রাচ্যের দক্ষিণাংশের একটি ভূ-খণ্ড। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় মধ্যস্থলে এবং ভূমধ্যসাগর ও জর্ডান নদীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি অবস্থিত। প্রাচীনকালে কেনান নামে পরিচিত ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডের আয়তন ছিল ২৫০০ বর্গকিলোমিটার। দেশটিকে ঘিরে মিশর, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবাননের অবস্থান। বর্তমানে ভূ-খণ্ডটি লম্বায় ১৫০ মাইল এবং প্রস্থে ১০০ মাইল। শীতে তীব্র শীত, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম, ধূসর প্রস্তরময় ভূমি, গিরিখাতসংকুল জুদাইন পর্বতের মাঝখানে এর প্রধান শহর জেরুজালেম অবস্থিত। প্রাচীন ফিলিসটাইনদের বসবাসকারী অঞ্চলকে বাইবেলে প্ল্যাসেট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাম্রযুগে ফিলিস্টিয়া বলতে বর্তমান গাজা ভূ-খণ্ডকে বুঝাতো।

গ্রীকরা একে Palaistine (ল্যাটিন Palaestina) বা Philistine-দের দেশ বলে আখ্যায়িত করত। কোনো কোনো সময় আরব মরুভূমি পর্যন্ত অঞ্চলকেও Palaistine (আরবী ফিলিস্তিন বা ফালাসতিন) বলা হতো। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগ ভূমি হওয়ায় এ অঞ্চল যাতায়াতের মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল। পূর্বদিকে ব্যাবিলোনিয়া আর দক্ষিণে মিশর– এই

Scanned by CamScanner

নাতিদীর্ঘ দেশটি মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, হিটাইট, আসিরীয় প্রভৃতি জাতির আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। তবে মিশরের ফারাও সাম্রাজ্য যখন পিরামিড ও মমি তৈরিতে খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করেছিল তখন এর অবস্থান ছিল ন্যূনতম পর্যায়ে। এ সময় ক্যানানাইটরা ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকাতে নিজেদের কর্তৃত্ব গড়ে তুলেছিল। পার্শ্ববর্তী সভ্যতার সংস্পর্শে তারাও উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। এরা লোহার ব্যবহার জানত, লেখার কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং হাম্মুরাবির আইনকে নিজেদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ক্যানানাইটরা জেরুজালেমের অন্যান্য জাতির চেয়ে দক্ষ নির্মাতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। তারা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা দেয়াল, সুউচ্চ টাওয়ার এবং নগর দুর্গের অংশ হিসেবে সারি সারি ঘর তৈরি করেছিল। [পরে সেগুলো ইসরাইলি রাজা নবী দাউদ (আ) দখল করে নিয়েছিলেন।]

খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরীয়রা ফিলিস্তিন দখল করে এবং নিজেদের শাসন কায়েম করে। এরা গাজা এবং জাফায় সেনাবাহিনী নিয়োগ দিয়েছিল। তবে স্বস্তিতে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিক সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি-এর মতে, 'এ সময় মিশরের ফারাওরা কেনান শাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে পেরেছিলেন কি না তা স্পষ্ট নয়।'[১] এই সময়টাতে হিব্রুরাও (ইসরাইলি) কানানভূমি দখলে তৎপর ছিলেন। তবে কানানভূমি দখল করতে হিব্রুদের দীর্ঘদিন লেগে যায়। এরই মধ্যে এই দুই জাতির চেয়ে শক্তিশালী ফিলিস্তিন জাতি এশিয়া মাইনর ও ঈজিয়ান উপসাগরীয় দ্বীপসমূহ থেকে এসে সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেয়। হিব্রুরাও প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে কিন্তু বারবার পরাজিত হয়। 'ইসরাইলের সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে কদাচারী হয়ে উঠেছিল। তখন প্রভু তাদের চল্লিশ বছরের জন্য ফিলিস্টাইনদের হাতে সঁপে দিলেন।' (Judges 13)

অবশ্য এরই মধ্যে প্যালেস্টাইন মিশরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস (খৃ. পূ. ১৩০০-১২৩৩ খৃ. পূ.) এর সময়। তবে তার মৃত্যুর পর মিশর সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের বন্ধন এক রকম ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখনই আবির্ভাব ঘটেছিল হিব্রুজাতির শ্রেষ্ঠনেতা নবী মূসা (আ)-এর। তবে ফিলিস্তিনিদের কাছে পরাজিত হয়ে হিব্রুরা হতোদ্যম না

[১] সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, জেরুজালেম (ইতিহাস), অনুবাদঃ মোহাম্মদ হাসান শরীফ ও অন্যান্য (ঢাকাঃ চারদিক, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৫৪।

Scanned by CamScanner

হয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্যালেস্টাইনে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তারা ফিলিস্তিনের অনুর্বর উপত্যকার কিছু অংশ দখল করে এবং যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে কানানবাসীদের সাথে মেলামেশার সাহায্যে তারা সাংস্কৃতিক সফলতা অর্জনের চেষ্টা করে। তাদের প্রথম রাজা সউল, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বহুবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তবে দীর্ঘ, নিষ্ঠুর আর রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষে তারা সফল হয়েছিল।

Scanned by CamScanner

কেনান : ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে বনী ইসরাইলের আগমন

বাইবেলের প্রথম পুস্তক জেনেসিসের মতে, হিব্রুদের গোষ্ঠীপতি (প্যাট্রিয়ার্ক) ছিলেন আব্রাম (ইবরাহীম আ)। তিনি উর (মেসোপটেমিয়া, বর্তমানে ইরাক) থেকে এসে হেবরনে বসতি স্থাপন করেন। দেশটির নাম ছিল কেনান। ঈশ্বর এই ভূ-খণ্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে।[২] অবশ্য ইসলাম এটা স্বীকার করে না। মহান আল্লাহ বলেন, ইবরাহীম ইহুদিও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। (৩ : ৬৭)

যাহোক, ঘটনা হচ্ছে ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা, তার সম্প্রদায় ও বাদশাহ্‌কে অত্যন্ত নম্রভাবে নসীহতের দ্বারা, যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা এক আল্লাহ্‌র দাসত্বের দিকে আহ্বান জানালেন। কিন্তু তার কওমের লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করলে স্বদেশভূমি ত্যাগ করে স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লুত (আ)-কে নিয়ে হিজরত করেন এবং কিছুদিন পর হাররানে এসে উপস্থিত হন। এই হাররান থেকেও পরবর্তীতে হিজরত করেন এবং ফিলিস্তিনের পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সমসাময়িককালে অঞ্চলটি কানানীয়দের দখলে ছিল। এখান থেকে তিনি শাকীমে (বর্তমান নাবলুস) গমন করেন। নাবলুসেও বেশি দিন অবস্থান না করে মিশর গমন করেন। মিশর থেকে কিছুদিন পর সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফিলিস্তিনের 'আস-সাব' নামক স্থানে অবতরণ করেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রামাল্লা ও ঈলিয়ার মধ্যবর্তী স্থান কিততায় চলে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি কেনানের হেবরনে (বর্তমান নাম মাদীনাতুল খালীল) ইন্তেকাল করেন এবং স্ত্রী সারার পাশে কবরস্থ হন। ইবরাহীম (আ)-এর অন্যতম পুত্র ইসহাক (আ) (ইংরেজি Issac, আইজাক) ফিলিস্তিনের

---

[২]প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

Scanned by CamScanner

হেবরনকেই কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। ফলে ফিলিস্তিনিরা তাকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তাদের দুর্ব্যবহার প্রফুল্ল চিত্তে বরদাশত করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বিরুস-সাব'আ নামক স্থানে চলে যান। এখানে তিনি একটা ইবাদতখানা নির্মাণ করেছিলেন। এরপর থেকে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেড়ে যায় যে, ফিলিস্তিনের প্রশাসকও তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান এবং হেবরনেই ইন্তেকাল করেন। বাবা-মায়ের পাশে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। ইসহাক (আ)-এর অন্যতম পুত্র হলেন ইয়াকুব (আ)। ইসরাইলিদের আদিপিতা ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম হলো ইসরাইল (আল্লাহ্‌র বান্দা)। তিনি কেনানে অর্থাৎ ফিলিস্তিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইয়াকুব (আ)-এর চার জন স্ত্রীর গর্ভে ১২ জন পুত্র এবং এক জন কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী রাহীলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইউসুফ (আ), যোশেফ ও বিনইয়ামীন। বিনইয়ামীন ব্যতীত সকল সন্তানই হাররানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইয়াকুব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র থেকে ১২টি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল এবং এরাই ইতিহাসে বনী ইসরাইল নামে পরিচিত হন। এদের সকলেরই অবস্থান ছিল শাম বা সিরিয়ায়। অর্থাৎ কেনানের আশেপাশেই। কেননা, প্রাচীন ভূগোলে ফিলিস্তিন নামে কোনো স্বতন্ত্র দেশের অস্তিত্ব ছিল না। ইয়াকুব (আ)-এর অন্যতম স্নেহভাজন পুত্র ইউসুফ (আ) বিমাতা ভাইদের ষড়যন্ত্রে ক্রীতদাস রূপে বিক্রিত হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মিশরের শাসকের (আজিজ মিশর) নিকট নীত হন। এক পর্যায়ে তিনি মিশরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের দিকে প্যালেস্টাইনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে অন্যান্য হিব্রুদের সাথে ইসরাইলিদের কেউ কেউ খাদ্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মিশরে গমন করেছিল। ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারও তখন চরম খাদ্য সংকটে পড়েছিলেন। তিনি তার সন্তানদের খাদ্যের জন্য মিশরে প্রেরণ করেছিলেন। ইউসুফ (আ) তার ভাইদের চিনতে পারলেন। তিনি ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং পিতা-মাতাসহ স্বীয় পরিবারের সদস্যদের মিশরে নিয়ে আসেন। ইয়াকুব (আ) তার পরিবারের ৭০ জন সদস্যকে নিয়ে মিশরে গমন করেছিলেন। মিশরে আগমনের পর তিনি আরও ১৭ বছর জীবিত ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইউসুফ (আ)-কে অসিয়াত করে যান যে, তার লাশ যেন তার পিতৃপুরুষ ইসহাক ও ইবরাহীম (আ)-এর কবরস্থানে দাফন করা হয়। ইয়াকুব (আ)-এর লাশ হাররানেই দাফন করা হয়।

Scanned by CamScanner

ইউসুফ (আ) তার পরিবারকে উর্বর অঞ্চল রামেসিসে স্থানান্তর করেন। তবে ইউসুফ (আ)-এর মৃত্যুর পর বনী ইসরাইলের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ফারাওদের দাসে পরিণত হয়। তাছাড়া মিশরীয়গণ নিজেদের সভ্য ভাবত এবং হিব্রুদের ঘৃণা করত। কোনো কোনো ফারাও তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। বনী ইসরাইলের ওপর নির্যাতন চরমে উঠলে আল্লাহ্ তা'য়ালা এই নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে তাদেরকে পরিত্রাণ দানের উদ্দেশ্যে মূসা (আ)-কে প্রেরণ করেন। ফারাওরা বনী ইসরাইলের সন্তানদের হত্যা করলেও মহান আল্লাহ্ মূসা (আ)-কে ফারাওদের গৃহেই লালনপালনের ব্যবস্থা করেছেন। মূসা (আ)-এর ঘুসিতে এক মিশরীর মৃত্যু হলে মূসা (আ) সিরিয়া সংলগ্ন মাদয়ানে হিজরত করেন। এখানে তিনি প্রায় ৮/১০ বছর যাবত রাখালের জীবনযাপন করেছিলেন। এরপর নবুয়্যতপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ফেরাউন মূসা (আ)-কে হত্যার সংকল্প করলে মূসা (আ) আল্লাহর হুকুম পালনার্থে বনী ইসরাইলকে রাত্রের মধ্যেই মিশর থেকে বের করে নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে গিয়ে উপনীত হন। বনী ইসরাইলকে ধাওয়ারত ফেরাউন ও তার বাহিনী পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং মূসা (আ) তার অনুসারীদের নিয়ে সিনাই উপত্যকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ অঞ্চলে তখন শক্তিশালী ফিলিস্তিনি সম্প্রদায় ক্ষমতায় ছিল। মূসা (আ) তার সম্প্রদায়কে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, কিন্তু বনী ইসরাইল লড়াই করতে অস্বীকার করে। তারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলো, 'হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত জাতি বাস করে। তারা সেই স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশই করবো না।'

মূসা (আ) প্রায় ছয় লক্ষ নির্যাতিত লোককে ফেরাউনের নিপীড়ন থেকে রক্ষা করেন এবং সিনাই উপত্যকায় পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে এমনভাবে দক্ষ করে তোলেন, যাতে তারা ফিলিস্তিনি শাসকদের নিকট থেকে রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিতে পারে। ১২০ বছর বয়সে মূসা (আ) ইন্তেকাল করলে ইউশা ইবনে নুন (বাইবেলে জোশুয়া) তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বনী ইসরাইলকে নিয়ে জর্ডান নদী অতিক্রম করে সুউচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ জনবহুল শহর উরায়হায় উপস্থিত হন। প্রাচীর ঘেরা এই দুর্গ শহরটি তারা ছয় মাস অবরোধের পর দখল করেন। কথিত আছে যে, ইউশা ইবনে নুন সিরিয়া অঞ্চলের একত্রিশ জন রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এই সময় বনী ইসরাইল বায়তুল মোকাদ্দাসে আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে বসবাস শুরু করে। তিনি তাওরাত মোতাবেক এখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মূসা (আ)-এর ইন্তেকালের সাতাশ বছর পর তিনি

Scanned by CamScanner

একশ সাতাশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই সময় পর্যন্ত ইসরাইল কোনো রাজ্য ছিল না; ছিল কয়েকটি গোত্রের কনফেডারেশন। এ সময় তারা ফিলিস্তিনিদের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। ফিলিস্তিনিরা ছিল ইসরাইলিদের চেয়ে উন্নত এবং এদের পদাতিক বাহিনী ছিল অনেক চৌকষ। খ্রিস্টপূর্ব ১০৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফিলিস্তিনিরা এবেনেজার যুদ্ধে ইসরাইলিদের পরাজিত করে এবং তাদের উপাসনালয় গুঁড়িয়ে দেয়। এই সময় ইসরাইলিরা বৃদ্ধ নবী শ্যামুয়েলের পরামর্শে যোদ্ধা সাউল নামক এক যুবককে তাদের সামরিক কমান্ডার নিযুক্ত করেন। তিনি ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং নিজেকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাউল-এর মৃত্যুর পর জামাতা দাউদ (আ) রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার রাজত্বকাল হিব্রু ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। তিনি ফিলিস্তিনি রাজ্যকে সংকুচিত করেন এবং নিজের অধীনে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। বারোটি হিব্রু গোষ্ঠীকে নিজ রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং জেরুজালেমে (শান্তি নিকেতন, Home of Peace) এক মনোরম রাজধানী নির্মাণ করেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি এমন এক রাজ্য গড়ে তোলেন, যার সীমান্ত ছিল লেবানন থেকে মিশর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে আজকের জর্ডান ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি দামেস্কেও স্থায়ী সেনা ছাউনি ছিল।

দাউদ (আ)-এর মৃত্যুর পর তার ছেলে সোলায়মান (আ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও সুপণ্ডিত সোলায়মান (আ) ছিলেন ঐক্যবদ্ধ হিব্রু রাজ্যের শেষ শাসক। তিনি সর্বপ্রথম ইসরাইলকে নৌশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, বায়ু চালিত জাহাজ নির্মাণ করেন এবং 'আকাবা' উপসাগরের তীরে বন্দর স্থাপন করেন। তিনি তামা ও লোহা ঢালাই করার চুল্লিও স্থাপন করেছিলেন। দাউদ (আ) মৃত্যুর পূর্বে মাউন্ট মোরিয়াতে একটি উপাসনালয় (টেম্পল)[৩] তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন সোলায়মান (আ)-কে। সোলায়মান (আ) তার রাজপ্রাসাদের পাশেই এই উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন। এটি ছিল তিনটি অংশের সমন্বয়ে তৈরি একটি কমপ্লেক্স। এটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছিল সাত বছরে। কমপ্লেক্সটি লম্বায় ছিল ১১৫ ফুট এবং প্রস্থে ৩৩ ফুট। এতে ডালিম ফুল ও পদ্মখচিত দু'টি স্তম্ভ-সংবলিত

[৩]টেম্পল মাউন্ট হলো মুসলমানদের হারাম শরীফ। স্থানটিতে আল আকসা মসজিদ, কুব্বাত আল সাখরা (ডোম অব দ্য রক) ইত্যাদি অবস্থিত। চারটি দরজার সাহায্যে এখানে প্রবেশ করা যায়। উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) উক্ত স্থাপনাগুলো নির্মিত হয়।

Scanned by CamScanner

একটি প্রবেশপথ ছিল। এর তিনদিকে দ্বিতল উঁচু কক্ষরাজিতে ঘেরা ছিল। দেয়াল ঘেঁষে ১০টি সোনার প্রদীপ রাখা ছিল। এখানে ছিল একটি সোনার টেবিল, একটি জলাধার ও পানি রাখার পাত্র। পাহারার জন্য জলপাই কাঠ দিয়ে তৈরি ও সোনা দিয়ে মোড়া ১৭ ফুট উঁচু একটি ছোট্ট কক্ষ ছিল।

তিনি নিজের প্রাসাদটি নির্মাণ করেছিলেন ১৩ বছর ধরে। পুরানো প্রাচীরগুলো সম্প্রসারণ করে তিনি মোরিয়াহ পাহাড়কে সুরক্ষিত করেছিলেন। এরপর থেকে এর নাম হয় জায়ন– যা দ্বারা মূল নগরদুর্গ এবং টেম্পল উভয়কেই বোঝাত। দীর্ঘ ৪০ বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর খ্রিস্টপূর্ব ৯৩০ সালে সোলায়মান (আ) পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যুর পর দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং উত্তরের দশটি হিব্রু গোত্র ইসরাইল রাজ্য স্থাপন করে। দক্ষিণের দুটি গোত্র 'জুডা' রাজ্য গঠন করে। ৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আসিরীয়গণ[৪] ইসরাইল দখল করলে ইহুদিরা বিশাল আসিরীয় সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবে 'জুডা' রাজ্যটি আরো একশত বছর টিকে ছিল এবং ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্যালডীয়[৫] সম্রাট নেবুচাদ নেজার জেরুজালেম লুট করে এ রাজ্যের নাগরিকদের দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। সম্রাট কাইরাস ইহুদিদের মুক্ত করে দেন। তবে ফিলিস্তিন পারস্য সাম্রাজ্যের আশ্রিত রাজ্য হিসেবেই থেকে যায়। ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের বিজয়ের পর এ রাজ্য মিশরের গ্রিক বংশীয় টলেমী রাজবংশের অধীনে চলে যায়। ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি রোমের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ৭০ খ্রিস্টাব্দে ইহুদিরা বিদ্রোহ করলে রোমকরা এখানে অভিযান প্রেরণ করে এবং জেরুজালেম লুণ্ঠন করে। রাজ্যটি তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারিয়ে রোমের প্রদেশে পরিণত হয় এবং এখানকার জনগোষ্ঠী দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে।

---

[৪]৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরা উত্তর মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিল। ১৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

[৫]আসিরীয়দের পরাজিত করে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা ক্যালডীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিলেন ৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ বংশের শাসক নেবুচাদ নেজারের সময় (৬০৪-৫৬১ খ্রি.পূ) ক্যালডীয় সাম্রাজ্য বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারসিয়ান (ইরানী) রাজা কাইরাসের হাতে এ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় তিন

দেশহীন-গোত্রহীন : পৃথিবীর পথে পথে

আসিরীয়গণ যখন সিরিয়া ও ফিনিসিয়া দখল করেন, তখন ইসরাইল অধিপতি হোসিয়া গোপনে মিশরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এ সংবাদ জ্ঞাত হয়ে আসিরীয় সম্রাট চতুর্থ সালমানেসার ইসরাইল আক্রমণ করেন। তবুও রাজধানী সামারিয়া প্রায় ২ বছর আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। সালমানেসারের হত্যাকাণ্ডের পর দ্বিতীয় সারগন আসিরিয়ার সম্রাট হন ৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সারগন সামারিয়া আক্রমণ করে তা দখল করে নেন, হোসিয়াকে অন্ধ করে দেন এবং দুই লক্ষ ইহুদিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে আসিরীয় সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন। সারগন এক শিলালিপিতে লেখেন, 'ভগবান সামাসের অনুগ্রহে রাজত্বের প্রথমভাগে আমি সামারিয়া নগর অবরোধ করে অধিকার করেছিলাম। ২৭,২৮০ জন অধিবাসীকে উৎখাত করেছিলাম। ... বন্দি অধিবাসীদের আসিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্থানে অন্যান্য পরাজিত জাতির ব্যক্তিদের স্থাপন করেছিলাম।'

আসিরিয়া কর্তৃক অধিকৃত ইসরাইলের স্বাধীনতা সেই যে বিলুপ্ত হয়েছিল, আর তা কখনো ফিরে আসেনি।[৬] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কাইরাস বন্দি ইহুদিদের মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তবে মুক্ত হওয়ার পরও তাদের মধ্যে প্যালেস্টাইনে ফিরে যেতে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি বরং ব্যাবিলনের উর্বর ভূমিতেই তারা বেশ শেকড় গেড়ে বসেছিল। প্যালেস্টাইনে তাদের ফেলে আসা ধন-সম্পদ নব আগন্তুক কয়েকটি সেমেটিক গোষ্ঠী ভোগ করছিল। তবে ব্যাবিলনের স্থানীয় মানুষ ইহুদিদের বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে কালক্রমে জেরুজালেম আবার একটি ইহুদি নগর হয়ে ওঠে। তবে এখানে আর কোনো শাসকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ

---

[৬]শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন প্যালেস্টাইন (ঢাকা : অরিত্র, ২০১৬ খ্রি.), পৃ.৭৬-৭৭।

Scanned by CamScanner

ঘটেনি, বরং প্রধান পুরোহিত (High Priest) হলেন শাসনকর্তা। সেই থেকে ইহুদি রাষ্ট্রটি একটি ধর্মীয় সংস্থায় পরিণত হলো এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ জুডাইজম (Judaisum) বা ইহুদি ধর্ম নামে আখ্যায়িত হলো। মাঝে কিছু সময়ের জন্য (১৪২-৬৩ খ্রি. পূ.) রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করলেও রোমান সেনাপতি প্যালেস্টাইন অধিকার করলে তারা আবার সাধারণ প্রজায় পরিণত হয়। তারপর থেকে তারা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশে নানান কষ্ট, গ্লানি, অবিচার, অত্যাচার সহ্য করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্যতা কখনো বিসর্জন দেয়নি। তারা শুধু নিজেদের স্বাতন্ত্র্যতা বজায়ই রাখত না, গ্রিকরা মূর্তি উপাসক বলে তাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্রব পরিহার, তাদের উৎসব-পার্বন বর্জনও করত। তারা গ্রিকদের আমোদ-প্রমোদকে ঘৃণা করত। তারা 'ঈশ্বর-নির্বাচিত জাতি' এমন বিশ্বাসে পরধর্মের প্রতি ছিল উন্নাসিক মনোভাব। তাদের এই মনোভাবকে গ্রিকরা তেমন গুরুত্ব না দিলেও রোমানরা গুরুত্বের সাথেই দেখে বিষয়গুলো এবং ৭০ খ্রিস্টাব্দে তাদের জেরুজালেমের টেম্পলও ভেঙে দিয়েছিল। তাদেরকে জেরুজালেম ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। যারা জেরুজালেম ছাড়েনি, তাদের হত্যাও করা হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েও তারা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য কখনও বিসর্জন দেয়নি এবং নিজেদের সর্বদা প্রবাসী বলেই মনে করত। খ্রিস্টীয় সমাজের সাথে তাদের কোনোরূপ আপস-রক্ষা হয়নি, ফলে সর্বত্র তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য হতো। কখনও কখনও তাদের ওপর নির্যাতনও নেমে আসত। মধ্যযুগে তারা ইউরোপের শহরগুলোর বাইরে নোংরা 'সেটো' (Shetto) বা বস্তিতে বসবাস করত অস্পৃশ্যের মতো। প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমির স্বত্বাধিকার ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। কোনো ব্যবসায়ী সংস্থায় তারা যোগদানও করতে পারত না। তবুও তারা নিজেদের বিত্তশালী ব্যাংকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। মুসলিম অধিকৃত ভূ-খণ্ডগুলোতে তারা সাবলীল এবং স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করত এবং তাদের ধর্ম পালনে কোনোরূপ বাধা প্রদান করা হতো না। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফার্ডিনান্ড স্পেনে খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ অথবা নির্বাসন– যে-কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়। নির্বাসনকেই বেছে নিয়েছিল ইহুদিরা। তবে ভেনিস ছাড়া কোথাও তাদের ঠাঁই মেলেনি। সৈয়দ আমির আলী বলেন, 'ইহুদিগণ ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর এগারো শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে; তারা তাদের ভাগ্যের অনেক সুদিন-দুর্দিন প্রত্যক্ষ করেছেন। .... প্রাচীন রোম তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে এবং

Scanned by CamScanner

অগ্নিসংযোগে ও রক্তের বন্যায় একটি জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করেছে। খ্রিস্ট ধর্মাধ্যুষিত কনস্টান্টিনোপল সমান নির্মম আক্রোশে তাদেরকে নিগৃহীত করেছে; কিন্তু অতীতের দুর্দশা ও দুর্গতি থেকে তারা ভবিষ্যতের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। নির্মম নির্যাতনকারীদের হাতে নিষ্পেষিত হয়েও তারা মানবতা ও শান্তির মূল্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়নি। মিশর, সাইপ্রাস ও সিরিনের শহরগুলোতে তারা যে বর্বর নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিল, সেখানে তারা বিশ্বস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখিয়েছিল– তা তাদের ভাবী দুর্ভাগ্যজনক নিয়তির জন্য কারো মনে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার করেনি। ইসরাইলিদের আবাসভূমির সম্পূর্ণ ভরাডুবি হয়েছিল; তারা পৃথিবীর বুকে পলাতক-এর ন্যায় সর্বত্র আশ্রয় সন্ধান করে ফিরেছে; কিন্তু সবখানে তারা তাদের অদম্য অহংকার ও হৃদয়ের বিদ্রোহী অনমনীয়তা বহন করে চলেছে, অগণিত প্রেরিত পুরুষদের প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করেছে। এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে ঈসা (আ) ধর্মান্ধ ইহুদিদের শক্তিশালী আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করেছিলেন সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের আশা নিয়ে; কিন্তু এক পক্ষকাল অতিবাহিত না হতেই তাকে তার কালের কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থের বেদীমূলে আত্মহুতি দিতে হয়েছিল।[৭]

তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্পেন ও পর্তুগালের উপদ্বীপে ধর্মযাজকদের হাতে নির্মম নিগ্রহ ভোগ করেছিল।[৮] বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইহুদিদের প্রার্থনা করাও নিষিদ্ধ করেছিলেন। অধিকাংশ খ্রিস্টান দেশসমূহে তাদের জমি ক্রয়ের অধিকার ছিল না। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের ইহুদিদের সাথে মেলামেশা করতে চার্চ নিষেধ করেছিল। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ল্যাটেরান কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহুদিদেরকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাজ পরতে বাধ্য করা হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির প্রশাসন ইহুদিদের এই ব্যাজ পরতে বাধ্য করেছিল। ইংল্যান্ডে এডওয়ার্ড এবং ফ্রান্সে ফিলিপের যুগে ইহুদিদের যানবাহনে চড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং শহরে প্রবেশ করতে হলে তাদের বিশেষ কর দিতে হতো। পোল্যান্ডে এক দশকের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি ইহুদিকে নির্বাসিত করা হয়। আলেকজান্ডার-এর মৃত্যুর পর জারের সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট জনতা ইহুদি বসতিসমূহে অগ্নিসংযোগ

---

[৭]স্যার সৈয়দ আমীর আলী, দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ ড. রশীদুল আলম (কলিকাতা : মল্লিক বাদ্রার্স, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ.২৮-২৯।)

[৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

Scanned by CamScanner

করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। আর হিটলার কর্তৃক ইহুদি নিগৃহীতকরণের ঘটনা তো সর্বজনবিদিত। নারী ও শিশুরাও হিটলারের হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় চার

ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে মুসলিম আধিপত্য

মুহাম্মদ (সা) ১০/১২ বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম সিরিয়ার 'বুসরা' শহরে গমন করেছিলেন। এখানে বাহীরা (জিরজিস) নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে পাদ্রী মুহাম্মদ (সা)-কে মক্কায় প্রেরণ করতে এবং ইহুদিদের থেকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) আরো একবার যুবক বয়সে খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ-এর ব্যবসার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে খাদিজা (রা)-এর গোলাম মায়সারাকে নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তবে তার সিরিয়া ভ্রমণের ঘটনাটি চমকপ্রদ হয়ে আছে ইসরা বা মিরাজের ঘটনায়। এদিন মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বোরাকে চড়ে মহানবী (সা) ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, মূসা, দাউদ, সোলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া ও ঈসা (আ)-সহ বনী ইসরাইলের হাজার হাজার নবীর স্মৃতিধন্য জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে আগমন করেছিলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে নবীগণের সালাতে ইমামতিও করেছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকেই তিনি সিঁড়ির মাধ্যমে মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। আবার মহান আল্লাহর দিদার লাভের পর এখানেই নীত হয়েছিলেন এবং এখান থেকেই বোরাকে চড়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "এই স্মরণীয় যাত্রার ক্ষেত্রে (জেরুজালেম) একটি পার্থিব স্টেশনের ভূমিকা পালন করেছিল, তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছে ইতোমধ্যেই পবিত্র শহর বলে পরিগণিত জেরুজালেম মুসলিম দুনিয়ায় মক্কা ও আল-মদীনার পরে তৃতীয় পবিত্র শহর বলে গণ্য হলো এবং আজও সেই স্থান বজায় আছে। আল-ইসরার স্মৃতি যে এখনও ইসলামী দুনিয়ার একটি জীবন্ত ও গতিশীল শক্তি, তা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্যালেস্টাইনে সংঘটিত গুরুতর অশান্তির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়।

Scanned by CamScanner

জেরুজালেমে ইহুদিদের 'ক্রন্দনের প্রাচীর' বলে পরিচিত স্থানটিকে মুসলিমরা মুহাম্মদের স্বর্গযাত্রায় ব্যবহৃত নারীর মুখ ও ময়ূরের লেজবিশিষ্ট পাখনাযুক্ত ঘোড়া বোরাক-এর থামার জায়গা বলে দাবি করায় এই অশান্তির সূত্রপাত হয়।"[৯]

হিজরতের পর মহানবী (সা) ইহুদিদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন (মদীনা সনদ) এবং জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসকেই 'কিবলা' করে প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছিল। শান্তি বিনষ্ট, আনুগত্যহীন এবং ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের মদীনা অবরোধের দিনও তারা পেছন থেকে আক্রমণ করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা এটেছিল। পি.কে. হিট্টি বলেন, 'অবরোধ উঠে যাবার পর (খন্দকের) মিত্রের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা) সামরিক অভিযানে নামলেন। এর ফলে তাদের মধ্যকার অগ্রণী উপজাতি বনু কুরাইজার ৬০০ শক্ত-সামর্থ্য মানুষ প্রাণ হারাল ও বাকিদের বহিষ্কার করা হলো। বনু কুরাইজা ছিল ইসলামের শত্রুদের মধ্যে প্রথম উপজাতি, যাদের স্বধর্ম ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল অথবা বিকল্প হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল। মুহাম্মদ (সা)-এর আগের বছরই আল-মদীনার আর এক ইহুদি উপজাতি বনু আন-নাজিরকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। আল-মদীনার উত্তরে অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গবেষ্টিত মরুদ্যান খাইবার-এর ইহুদিরা ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং কর দিতে শুরু করেছিল।"[১০]

স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'পর পর আসিরীয়, গ্রিক ও রোমকদের দ্বারা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদিরা আরবদের মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের সেই সুতীব্র মনোভাব বহন করে এনেছিল, যা তাদের অধিকাংশ দুর্গতির মূলে ছিল।"[১১]

---

[৯]ফিলিপ. কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, অনু: জয়ন্ত সিংহ ও অন্যান্য (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ ১২৪-১২৫।

[১০]প্রাগুক্ত, পৃ . ১২৬-১২৭।

[১১]স্যার সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, প. ৫৫।

Scanned by CamScanner

মুহাম্মদ (সা)-এর সমসাময়িককালে জেরুজালেমে এবং সিরিয়ায় খ্রিস্টধর্মের আধিপত্য বিরাজ করছিল। বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস জেরুজালেমে প্রকৃত খ্রিস্টধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার দরবারে মুহাম্মদ (সা) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে দেহিয়া বিন খালীফা কালবী (রা)-কে পত্রসহ প্রেরণ করেন। জেরুজালেমে অবস্থানরত রোম সম্রাট বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দিয়ে মুসলিম দূতকে সম্মানিত করেন এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যেও মূল্যবান হাদিয়া প্রেরণ করেন। তবে সম্রাটের প্রতিনিধি বোসরার গভর্নর শোরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী মহানবী (সা)-এর প্রেরিত দূত হারেস ইবনে ওমায়র আযদী (রা)-কে হত্যা করে। এ কারণে তিনি যায়েদ বিন হারেসা (রা)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে 'মুতাহ' নামক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করেন। এই এলাকায় পূর্ব থেকেই এক লক্ষ রোমক সৈন্য মোতায়েন করা ছিল এবং তাদের সাথে আরো এক লক্ষ সৈন্য যোগ দেয়। তবুও মুসলিম বাহিনী রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে পরপর তিন জন সেনানায়ক শাহাদত বরণ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তরবারি খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ নিরাপদে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই যুদ্ধই পরবর্তীতে এই অঞ্চলে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পটভূমি হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর উদীয়মান মুসলিম শক্তিকে নস্যাৎ করতে রোম সম্রাট মুসলমানদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন মুহাম্মদ (সা) মুসলিম এলাকায় রোমকদের প্রবেশের পূর্বেই তাদের আটকে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন। তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এজন্য মুসলমানগণ তাদের সর্বোচ্চ অর্থ-বিত্ত জিহাদ ফান্ডে জমা দেন। ৯ম হিজরির রজব মাসের এক বৃহস্পতিবারে মহানবী (সা) ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তবে রোমক বাহিনী পিছু হটায় কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। রোমকদের কেন্দ্রবিন্দু সিরিয়া ও তার আশেপাশের খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ/গোত্রপতিরা মুসলমানদের সাথে স্বেচ্ছায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। মহানবী (সা) মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রোমক শাসকদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দমনের জন্য সালাম ইবনে যায়েদ (রা)-কে এই বলে প্রেরণ করেছিলেন, 'বালকা এলাকা এবং দারুসের ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড নাস্তানাবুদ করে এসো।'[১২] অভিযানটি মুহাম্মদ (সা)-এর ইন্তেকালের কারণে

---

[১২]আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতূম, অনু: খাদিজা আখতার রেজায়ী (ঢাকা : আল কোরআন একাডেমি পাবলিকেশন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫০২।

Scanned by CamScanner

স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আবু বকর (রা)-এর খিলাফত লাভের পর এ অভিযান পুনরায় প্রেরিত হয়। এতে মুসলিম বাহিনী সফলতা অর্জন করেছিল। তবে মূল অভিযান শুরু হয়েছিল এর পরপরই। রিদ্দার যুদ্ধগুলো শেষ হলে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে আবু বকর (রা) আমর ইবনুল আস, ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান এবং শুরাহবিল ইবনে হাসানার নেতৃত্বে তিনটি সেনাবাহিনী দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। প্রত্যেকের অধীনে ছিল ৩০০০ করে সৈন্য। ডেড সি'র দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াদি আল-আরাবা নামক জায়গায় সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ইয়াজিদের নিকট প্যালেস্টাইনের সার্জিয়াস দি প্যাট্রিসিয়ান পরাজিত হন। পরবর্তীতে গাজার নিকটবর্তী স্থানে সার্জিয়াসের পুরো বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। খলিফার নির্দেশে সেনানায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) ইরাক থেকে সিরিয়ায় গমন করেন এবং আজানদাইনের প্রান্তরে (৬৩৪ খ্রি. ৩০শে জুলাই) বাইজান্টাইন বাহিনীকে পরাজিত করলে সমগ্র প্যালেস্টাইনের দরজা তাদের সামনে খুলে যায়। সামান্য প্রতিরোধের পর বোসরারও পতন ঘটে। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হয়। আবু উবায়দাহ (রা) এ অঞ্চলের মুসলিম গভর্নর নিযুক্ত হন। তবে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম তার নগরীর দরজা বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। জেরুজালেমের পতনের পর এখানকার গীর্জাপ্রধান খলিফার নিকট ছাড়া চাবি হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। মুসলিম খলিফা উমর (রা) সেখানে গিয়েছিলেন এবং চাবি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। গির্জার মিষ্টভাষী রক্ষক হিসেবে খ্যাত জেরুজালেমের বিশপ সোফ্রোনিয়াস সেই বৃদ্ধ খলিফাকে তাদের পবিত্র গীর্জাগুলো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। সেই আরবীয় দর্শনার্থীর শিক্ষাসভ্যতাহীন হাবভাব ও জীর্ণ পোশাক দেখে তিনি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি খলিফার অনুগামীতে পরিণত হলেন।[১৩] নামাজের সময় মুয়াজ্জিন আজান দিলে বিশপ তাকে সেখানেই নামাজ আদায়ের অনুরোধ করেন। তবে তিনি সেই অনুরোধ রাখলেন না; তিনি বললেন, এমন করলে স্থানটি মসজিদে পরিণত হবে। তিনি ও তার যোদ্ধারা টেম্পল মাউন্টে (বায়তুল মুকাদ্দাস) প্রবেশ করলেন। তারা দেখতে পেলেন, ইহুদিদের কষ্ট দিতে খ্রিস্টানরা 'বিষ্টা' দিয়ে স্থানটি নোংরা করে রেখেছে। এরপর উমর (রা) টেম্পলের ফাউন্ডেশন পাথর দেখলেন, যেটাকে মুসলমানরা সাখরা বলত। এরপর উমর (রা) তার সৈন্যদের সহায়তায় নামাজ পড়ার জায়গা প্রস্তুত করলেন আবর্জনা হটিয়ে এবং এখানে প্রথম নামাজঘর স্থাপন করলেন 'সাখরার' দক্ষিণে; এটি

[১৩] ফিলিপ. কে. হিট্টি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

Scanned by CamScanner

মূলত এখন আল-আকসা মসজিদটির স্থান। কয়েক'শ বছরের বাইজেন্টাইন শাসনে পিষ্ট ইহুদিরাও মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল।[১৪]

আরব বিজয়ীগণ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফিলিস্তিনে একই নিয়ম অনুসরণ করেন অর্থাৎ এই স্থানে পূর্ববর্তী শাসন কাঠামো রাখা হয়। অনেকেই তো দাবি করে, জেরুজালেমে উমরের প্রথম গভর্নর ছিলেন একজন ইহুদি।[১৫] তবে এটা সত্য– উমর (রা) জেরুজালেমে ইহুদি প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই তাই বেরিয়াসের ইহুদি সম্প্রদায়ের (দ্য গাওন) নেতাদের এবং ৭০টি ইহুদি পরিবারকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দক্ষিণে বসতি স্থাপন করেছিল।

ফিলিস্তিন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে বিদ্যমান থাকে। কেবল তার প্রাক্তন নাম Palaestine Prima এর স্থলে জুন্দ ফিলাসতিন রাখা হয়। উমর (রা) উবাইদা ইবনে আল সামিতকে জেরুজালেমের বিচারক, হলি সিপালচর ও রকের (পবিত্র পাথর) অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এর রাজধানী কাইসারিয়া থেকে লূদ্দ-এ স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে রামাল্লা শহর তৈরি করে রাজধানী এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। গভর্নর সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক এই রামাল্লা শহর নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে খলিফা হয়েও (৭১৫ খ্রি.) তিনি এখানে থাকতেই পছন্দ করতেন। মঙ্গোল আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি প্রশাসনিক জেলা হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিক আল ইস্তাখরী বলেন যে, প্রদেশের সর্ববৃহৎ শহরের নাম রামাল্লা। আল ইয়াকুতের মতে, বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং রাজধানী শহর।[১৬]

আলী (রা)-এর শাহাদতের পর সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া (৬৬১ খ্রি.) ইলিয়াতে (জেরুজালেম) আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তিনি দামেস্ক থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও জেরুজালেমকে বিশেষ ভক্তি করতেন; নগরটিকে মুদ্রায় তিনি ইলিয়া ফিলাস্তিন (অ্যালিয়া প্যালেসটিনা) হিসেবে প্রচার করেছিলেন।[১৭] মুয়াবিয়া (রা) অনেক বেশি ইহুদিকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিলেন; সম্ভবত সে কারণে

---

[১৪]সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

[১৫]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

[১৬]ইসলামী বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ ১৫৪।

[১৭]সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

Scanned by CamScanner

ইহুদিরা তাকে 'ইসরাইল প্রেমিক' বলতো। মুয়াবিয়া (রা)-কেই অনেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রকৃত স্রষ্টা বলে থাকেন। তিনি এখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, টেম্পল মাউন্টের ঠিক মাঝখানে। সম্ভবত মাউন্ট মোরিয়া কেটে এটাকে সোজা করে পবিত্র পাথরের (রক) ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর প্রখ্যাত উত্তরাধিকারী খলিফা আব্দুল মালিক (৬৮৪-৭০৫ খ্রি.) মসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ করেন এবং কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অব দ্য রক) নির্মাণ করেন। 'কুব্বাত আল সাখরা' মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের বহুল পরিচিত একটি গম্বুজ। ডোমটির রক্ষণাবেক্ষণে যারা নিয়োজিত ছিল, তাদের মধ্যে ২০ জন ছিল ইহুদি। এটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, 'আর ২১ শতকে এটা চূড়ান্ত সেক্যুলার পর্যটক প্রতীক, পুনরুত্থিত ইসলামের তীর্থস্থান এবং ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র। এটা এখনো বর্তমান জেরুজালেমকে সংজ্ঞায়িত করে।"[১৮]

খলিফা আব্দুল মালিকের পুত্র আল ওয়ালিদ টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ সীমানার মধ্যে দূরবর্তী মসজিদ তথা আল আকসা মসজিদ নির্মাণ করেন। আসলে ৬৪১-৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আকসা মসজিদকে ভেঙে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। দামেস্ক উমাইয়াদের রাজধানী হলেও খলিফাগণ জেরুজালেমেই থাকতে পছন্দ করতেন। খলিফা সোলায়মান রামাল্লা নগরী প্রতিষ্ঠা করলেও জেরুজালেমকে রাজধানী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

এ সময় ইহুদিরা ইরান, ইরাক থেকে জেরুজালেমে আসে এবং টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণে বসবাস শুরু করে। তারা টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করার এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাও পেত। তবে ৭২০ খ্রি. উমর বিন আব্দুল আজিজ তাদের প্রার্থনা করার অনুমতি বাতিল করে দেন। ফলে তারা টেম্পল মাউন্টের চার দেয়ালের পাশে এবং ভূগর্ভস্থ সিনাগগে (ওয়ারেন'স গেটে হা-মেরা-দ্য কেভ বা পবিত্র গুহা), হলি অব হলিজের কাছে টেম্পল মাউন্টের ঠিক নিচে প্রার্থনা করতে শুরু করে।

উমাইয়াদের পর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় আব্বাসীয়গণ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)। তাদের সময়ে জেরুজালেম জিয়ারতের স্থানে পরিণত হয়েছিল। আব্বাসীয়দের কর্মক্ষেত্র ছিল বাগদাদ তথা ইরাক। তাই জেরুজালেম ছিল তাদের কাছে এক প্রত্যন্ত অঞ্চল। ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস দ্য গ্রেট (রোমে শার্লেমেন নামে পরিচিত) ও আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মাথাপিছু (৮৫০ দিনার) করের

[১৮]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

Scanned by CamScanner

বিনিময়ে শার্লেমেন হলি সেপালচরের পাশে একটি আশ্রম, পাঠাগার, ১৫০ জন সন্ন্যাসী ও ১৭ জন নানের জন্য তীর্থযাত্রী হোস্টেলসহ খ্রিস্টান কোয়ার্টার নির্মাণ করার অনুমতি নিয়ে নেন খলিফার নিকট থেকে। মূলত জেরুজালেমে আব্বাসীয়দের তেমন প্রভাব ছিল না। ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে আহ্মদ ইবনে তুলুন খলিফার ন্যূনতম আনুগত্য প্রকাশ করে মিশরের শাসক হন, তিনি জেরুজালেমের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এরপর থেকে জেরুজালেমে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়। ইহুদিরা এ সময় দু'টি গ্রুপে বিভক্ত ছিল। যথা: গাওন (রাব্বানিয়াত) ও কারাইতেস (এরা শুধু তাওরাতে বিশ্বাসী)। এই কারাইতেসরা জায়নে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করত। মুহাম্মদ ইবনে তুগজ আল ইখশিদ (ইবনে তুলুনের ছেলে ও উত্তরসূরি নিহত হলে) মিশর ও জেরুজালেম শাসন করতেন। ৯৪৬ খ্রি. তিনি মারা গেলে তাকে জেরুজালেমে কবর দেওয়া হয়। তার ক্রীতদাস মালিক কাফুরের নতুন গভর্নর নিযুক্ত হন। এ সময় ইহুদিরা মালিক কাফুরের গভর্নরের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। কাফুরের গভর্নর খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন শুরু করলে তারা কনস্টান্টিনোপলের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। এটা ধরা পড়লে গভর্নর ইহুদিদের নিয়ে সেপালচর আক্রমণ করেন এবং প্যাট্রিয়ার্ককে পুড়িয়ে হত্যা করেন। মালিক কাফুর এক ইহুদিকে মন্ত্রীও নিযুক্ত করেছিলেন। উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয়গণ (৯৬৯-১০৯৯ খ্রি.) তাদের শাসন কায়েম করেছিলেন। শীঘ্রই তারা মিশর দখল করেন এবং কায়রোতে তাদের রাজধানী স্থাপন করেন। ফাতেমীয়দের বিখ্যাত সেনানায়ক জাওহার জেরুজালেম দখল করেছিলেন এবং প্যালটিয়েল নামের এক ইহুদি জাওহারের অনুগ্রহভাজন হিসেবে আস্থার্জন করেন এবং জেরুজালেমে ইহুদিদের সহায়তা শুরু করেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম প্রশাসন জেরুজালেমের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েন, ফলে এখানকার অবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। কায়রো ও বাগদাদের শাসকগোষ্ঠী পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে বাইজেন্টাইন সম্রাট (৯৭৪ খ্রি.) দামেস্ক দখল করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, মুসলমানদের কবল থেকে হলি সেপালচরকে মুক্ত করবেন। তবে তিনি পরবর্তীতে আর অগ্রসর হননি। তবে এ সময় ফ্রাঙ্করা সাগর পথে এবং প্রতি ইস্টারে মিশর থেকে কাফেলা আসত এখানে। উল্লেখ্য যে, এরা ছিল অনেক বেশি ধনী এবং ক্ষমতাসীন মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি। এ সময় ইহুদিরা তেমন মূল্যায়িত হতো না, তবে তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত। রাব্বানিয়াত ও কারাইতেসরা আলাদা আলাদা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। অনেক

Scanned by CamScanner

সময় তারা এইসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নোংরা ও ভগ্নপ্রায় সিনাগগ এবং ভূগর্ভস্থ পবিত্র গুহাগুলোতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। তারা মানুষের করুণার পাত্র এবং হয়রানির শিকার হতো প্রায়ই। ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিম (খ্রিস্টান মায়ের সন্তান এবং তার মামারা ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক) ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের গ্রেফতার ও ফাঁসি দেওয়া শুরু করেন, জেরুজালেমের সব চার্চ বন্ধ করে সেগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ইস্টার, মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন এবং ইহুদিদের কাঠের গলাবন্ধনী ও খ্রিস্টানদের লোহার ক্রুশ পরতে বাধ্য করেন। ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের সিনাগগগুলো ধ্বংস করা হয়। তিনি মুসলমানদের ওপরও নির্যাতন শুরু করেন এবং রমজান নিষিদ্ধ করেন। ফলে শিয়া-সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমানও তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শুরু করে। ফলে তিনি আবারও ইহুদি-খ্রিস্টানদের দ্বারস্থ হন এবং চার্চ ও সিনাগগগুলো নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। ১০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাগলা রাজা হাকিম রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যান। পরবর্তী খলিফা আজ-জাহিরের সময় খ্রিস্টানদের চার্চ পুনর্নির্মিত হয় এবং নগরীতে তীর্থযাত্রীর ঢল নামে। ইহুদি ও খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা আসত ফ্রান্স ও ইতালি থেকে আর মুসলিম পর্যটকরা আসত হজ্ব মৌসুমে। ফাতেমীয় শাসনের শেষ দিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে তারা জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খায়। এ সময় দস্যুরা তীর্থযাত্রীদের ওপর আক্রমণও করত।

১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্যাসবার্গের বিশপ আরনল্ডের নেতৃত্বে সাত হাজার জার্মান ও ডাচ তীর্থযাত্রীর একটি কাফেলা প্রাচীরের বাইরে আক্রমণের শিকার হয় এবং পাঁচ হাজার তীর্থযাত্রী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। যদিও চারশ বছর ধরে জেরুজালেম মুসলমানদের হাতে আছে, তবুও এ ধরনের নৃশংসতা হঠাৎ করে এ ধারণার সৃষ্টি করল– হলি সেপালচর চার্চ ঝুঁকিপূর্ণ।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় পাঁচ

ক্রুসেড : জেরুজালেমে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই

আব্বাসীয় খিলাফতের শেষের দিকে দূরবর্তী প্রদেশসমূহে তাদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। এ সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে তুর্কিগণ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস পান। এই রকম এক সময়ে ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেলজুক নামক এক সেনাপতি তুর্কি জাতির গাজ (অথবা ওগাজ) সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মধ্যএশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালান। সেলজুকের পৌত্র তুগরিল বেগ খোরাসান, মার্ভ, নাইসাবু, বলখ, জুরজান, তাবারিস্তান, খাওয়ারিজম, হামাদান, আল-রাযি, ইস্পাহান প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। এক পর্যায়ে বুয়াইয়াদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া আব্বাসীয় খলিফা আল কায়িম বিল্লাহ (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) তুগরিল বেগকে বাগদাদে আমন্ত্রণ জানালে বুয়াইয়া রাজবংশের সর্বশেষ প্রতিনিধি ও বাগদাদের সামরিক গভর্নর আল-বাসাসিরি বাগদাদ ত্যাগ করেন। তুগরিল বেগকে খলিফা পূর্ব ও পশ্চিমের প্রশাসক হিসেবে স্বাগত জানালেন। 'আল-সুলতান' হলো তার আনুষ্ঠানিক উপাধি। এ বংশের গুরুত্বপূর্ণ তিনজন শাসক হলেন তুগরিল (১০৩৭-১০৬৩ খ্রি.), তার ভাইপো আল্প আরসালান (১০৬৩-১০৭২ খ্রি.) এবং ভাইপোর ছেলে মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২ খ্রি.)। তাদের সময়ে পশ্চিম এশিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয় এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হয়। রাজত্বের দ্বিতীয় বছরেই আল্প আরসালান খ্রিস্টান আর্মেনিয়ার রাজধানী এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ দখল করে নেন। শীঘ্রই মুসলিম সাম্রাজ্যের এই পুরানো শত্রুদের সাথে সংঘাত শুরু হয় এবং ম্যানজিকার্টের (১০৭১ খ্রি.) চূড়ান্ত যুদ্ধে আরসালান জয়লাভ করেন এবং সম্রাট রোমানস ডায়োজিনিসকে বন্দি করেন। পুরো এশিয়া মাইনর এলাকায় প্রথমবারের মতো মুসলমানগণ স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন।

Scanned by CamScanner

আরসালানের সেনাপ্রধান আতসিজ জেরুজালেম দখল করে নেন ফাতেমীয়দের নিকট থেকে। তিনি ফাতেমীয়দের নিকট থেকে দামেস্কও দখল করেন। আল্পের জ্ঞাতিভাই সোলায়মান ইবনে কুলুতমিশ রুমে সেলজুকদের সালতানাত স্থাপন করেন ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে এবং দূরবর্তী নিসিয়াতে (নিকিয়া/ইজনিক) রাজধানী স্থাপন করেন। (উল্লেখ্য যে, এখান থেকেই ক্রুসেডাররা সোলায়মানের পুত্র ও উত্তরসূরি কিলিজ আরসালানকে বিতাড়িত করে।)

১০৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইনদের সবচেয়ে ধনী, সমৃদ্ধ ও সুন্দর শহর ইকোনিয়াম (কুনিয়া/কোনিয়ে) সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১০৭২ খ্রিস্টাব্দে আরসালান মারা গেলে সুলতান হন মালিক শাহ্। খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ (১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.) সুলতান মালিক শাহ্র কন্যাকে বিয়ে করেন। এই মালিক শাহ্র (১০৭২-১০৯২ খ্রি.) সময় সেলজুক রাজবংশ সাফল্যের চূড়ায় আরোহণ করে। এ সময় সেলজুক সাম্রাজ্য দৈর্ঘ্যে তুর্কিস্তান থেকে জেরুজালেম ও প্রস্থে কনস্টান্টিনোপল থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ১০৯২ খ্রিস্টাব্দে মালিক শাহ্ ইন্তেকাল করলে সেলজুক সাম্রাজ্যে বিভাজন দেখা দেয় এবং গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটে। মালিক শাহ্র পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং সেলজুক রাজবংশের পতন ঘটে। ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে অনেকগুলো স্বাধীন, আধা-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। মালিক শাহ্র মৃত্যুর পূর্ব থেকেই সিরিয়ার প্রতিটি শহরই স্বতন্ত্র শাসকের অধীনে ছিল। এই সময়টাতেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে খ্রিস্টান যোদ্ধারা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম ভূ-খণ্ড আক্রমণ করে। কিন্তু সেলজুক কিংবা আব্বাসীয়গণ কেউই এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেনি। অথচ উপকূল ও উত্তর সীমান্তে বাইজেন্টাইনদের আক্রমণ চলত অনবরত।

এশিয়ায় সম্রাট অ্যালেক্সিয়াস কমনিনাসের যে সাম্রাজ্য ছিল, তা পূর্বেই সেলজুকরা ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং তারা কনস্টান্টিনোপলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আলেক্সিয়াস কমনিনাস পোপ দ্বিতীয় আরবানের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। ১০৯৫ সালের ২৬শে নভেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের কেরমঁতে পোপ ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের একত্রিত করেন এবং তাদের উদ্দেশে বলেন, 'পবিত্র সমাধিস্তম্ভের দিকে অগ্রসর হও; পাপীদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে তা অধিকার করো। ঈশ্বর তাই চান।'

Scanned by CamScanner

পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফ্রাঙ্ক, নরমানসহ সমাজের নিম্নস্তরের দেড়লক্ষ মানুষ কনস্টান্টিনোপলে সমবেত হয়। বোহেমন্ডের মতো নেতা নেতৃত্বের লোভে; পিসা, ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকরা বাণিজ্যিক স্বার্থে; আবেগী ধর্মপ্রাণ, পাপ মোচনে প্রত্যাশী অপরাধী এবং আত্মরক্ষার তাগিদে ফ্রান্স, লোরেন ও সিসিলির জনসাধারণ এতে যোগ দেয়। প্রথমেই তারা এশিয়া মাইনরের তরুণ সুলতান কিলিজ আরসালানের কুনিয়াহ আক্রমণ করে এবং তা দখল করে নেয়। ১০৯৮ সালে বল্ডউইনের নেতৃত্বে আল-রুহা দখল করে নিয়ে প্রথম লাতিন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং বল্ডউইন (বুলোনের কাউন্টোর পুত্র) প্রশাসক নিযুক্ত হন। দক্ষিণ ইতালির নরমান ট্যানক্রেডের নেতৃত্বে টারসাস দখল করে ক্রুসেডাররা। সেলজুক আমির যাগি-সিয়ানকে হটিয়ে বোহেমন্ড দখল করে এ্যান্টিয়ক। তুলুজের রেমন্ড দখল করে মাআররাত আল নুমান। এখানে প্রায় লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করে এবং পুরো শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর বেশ কয়েকটি অঞ্চল দখল করে এবং ভ্রাতা বুইলনের গডফ্রের সাথে জেরুজালেম অভিমুখে যাত্রা করে। ক্রুসেডাররা প্রথমে রামাল্লা দখল করে এবং ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে জেরুজালেমের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। এক মাস অবরোধের পর ঝড়ের গতিতে শহরে প্রবেশ করে এবং নৃশংস হত্যালীলা চালায়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই রেহাই পায়নি। শহরের সর্বত্র মানুষের কাটা হাত-পা, মাথা স্তূপাকারে পড়েছিল। প্রায় সকল মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। ইহুদিদেরকেও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। জীবিত ইহুদিদের দিয়ে শহর পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং যুদ্ধবন্দি হিসেবে ইতালিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। আল-আকসা মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে এবং ডোম অব দ্য রককে গীর্জায় রূপান্তর করা হয়। জেরুজালেমে লাতিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গডফ্রে এখানকার প্রশাসক নিযুক্ত হন। তার সময় জেরুজালেম এক বাণিজ্যিক বৃত্তে পরিণত হয়। তবে তার মৃত্যুর পর শুরু হয় লুটতরাজ এবং ভেনিসের সেনাবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে হাইফা ও আক্কা দখল করে নেয়। এ সময় জেরুজালেমের প্রশাসক ছিলেন গডফ্রের ভ্রাতা বল্ডউইন (১ম)। উল্লেখ্য যে, এই ক্রুসেডাররা শুধুমাত্র মুসলমানদেরই হত্যা করেনি, ইহুদিদেরও নির্যাতন করে। জার্মানি এবং ফ্রান্সে ইহুদিদের মুসলমানদের মতোই শত্রু হিসেবে গণ্য করা হতো। কেননা, যিশুর ক্রুশবিদ্ধের জন্য (যদিও মুসলমানরা তা বিশ্বাস করে না) তারা ইহুদিদের দায়ী করত। ইহুদিরা ছিল দূরবর্তী মুসলমানদের চেয়ে দৃশ্যমান। তাই ফ্রান্স ও জার্মানির কৃষক ক্রুসেডাররা ইহুদিদের ওপর সহিংস আক্রমণ করে বসে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইহুদিদের বিরুদ্ধে

Scanned by CamScanner

এ সহিংসতাকে প্রথম হলোকাস্ট (এই হত্যাযজ্ঞ বাইনল্যান্ড হত্যাযজ্ঞ হিসেবে পরিচিত) হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ইহুদিদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, গডফ্রে এই চাঁদা আদায় করেছিলেন। মেইঞ্জে কমপক্ষে এগারো'শ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। আইজ্যাক নামক এক ইহুদিকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলে, সে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

যাহোক, খ্রিস্টানরা জেরুজালেম দখল করলেও বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের উপকূলবর্তী সামান্য এলাকার ওপর আধিপত্য কায়েম করেছিল। খ্রিস্টানরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলে মালিক শাহ্‌র এক ক্রীতদাসের সন্তান মাওসিলের শাসনকর্তা (আলেপ্পো, হাররান এবং মাওসিল নিয়ে গঠিত) নীলচক্ষু বিশিষ্ট ইমাদ আল দ্বীন আতাবেগ (১১২৭-১১৪৬ খ্রি.) জাঙ্গি প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় জোসেলিনের নিকট থেকে আল-রুহা ছিনিয়ে নেন। ফলে জার্মানির তৃতীয় কনরাড এবং ফ্রান্সের সপ্তম লুই দ্বিতীয় ক্রুসেডের (১১৪৭-১১৯১ খ্রি.) প্রস্তুতি গ্রহণ করে মধ্যপ্রাচ্যে আগমন করেন। কিন্তু জাঙ্গি (১১২৭-১২৬২ খ্রি.) সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী জাঙ্গিপুত্র নূর আল দ্বীন মাহ্‌মুদ (১১৪৬-১১৬৯ খ্রি.) তাদের প্রতিহত করেন। নূর আল দ্বীন ১১৫৪ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক দখল করলে জেরুজালেমের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাধা দূর হয়। তিনি ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে আল রুহার পূর্বতন শাসক দ্বিতীয় জোসেলিন এবং ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে অ্যান্টিয়কের শাসক তৃতীয় বোহেমন্ড ও তার সহযোগী ত্রিপোলীর শাসক তৃতীয় রেমন্ডকে বন্দি করেছিলেন। অবশ্য মুক্তিপণের বিনিময়ে এক জনকে এক বছর আরেক জনকে ৯ বছর পর ছেড়ে দেন।

গাজী সালাউদ্দীন আইয়ুবীর উত্থান

নূর আল দ্বীনের সুযোগ্য সেনাপতি শিরকুহের ভ্রাতুষ্পুত্র সালাউদ্দীন আইয়ুবী তার স্থলাভিষিক্ত হন। ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরের উজির নিযুক্ত হন এবং ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মিশর থেকে ফাতেমীয় মতবাদের স্থলে সুন্নী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জুম্মার খুৎবা থেকে ফাতেমীয় খলিফার নাম বাদ দিয়ে আব্বাসীয় খলিফার নাম অন্তর্ভুক্ত করেন (১১৭১ খ্রি.)। আব্বাসীয় খলিফা তাকে মিশর, আল-মাগরিব, নুবিয়া, পশ্চিম আরব, প্যালেস্টাইন এবং মধ্য সিরিয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তিনি হিট্টিনের (হাট্রিন) যুদ্ধে ক্রুসেডারদের পরাজিত করেন। তার হাতে

Scanned by CamScanner

আনুমানিক ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক সৈন্য বন্দি হয় এবং জেরুজালেমের রাজা গাই দ্য লুসিগনানসহ বহু বিশিষ্ট ক্রুসেডযোদ্ধা নেতা বন্দি হয়। জেরুজালেমে মুসলিম আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (২রা অক্টোবর, ১১৮৭ খ্রি.)। আকসা মসজিদে বন্ধ হয়ে যায় খ্রিস্টানদের ঘণ্টা ধ্বনি। জেরুজালেমের আকাশ-বাতাস আজানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এবং ডোম অব দ্য রকের চূড়ায় স্থাপিত সোনার ক্রুশ ভেঙে ফেলা হয়। তিনি ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশ কিছু অঞ্চল দখল করেন। ফলে এ অঞ্চলে ফ্রাঙ্কদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

জেরুজালেমের পতনে বিভেদ ও বিরোধ ভুলে জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা আবার এগিয়ে আসে। শুরু হয় তৃতীয়বারের মতো ধর্মযুদ্ধ (১১৮৯-১১৯২ খ্রি.)। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে জেরুজালেমের সাবেক শাসনকর্তা রাজা গাইও এসেছিলেন হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে। ক্রুসেডাররা এসে আক্কা অবরোধ করে। মধ্যযুগের যুদ্ধের ইতিহাসে এটি ছিল দীর্ঘতম অবরোধ (২৭শে আগস্ট, ১১৮৯-১২ই জুলাই, ১১৯১ খ্রি.)। আক্কা আত্মসমর্পণ করলে ক্রুসেডার সেনাপতি রিচার্ড দু'হাজার সাতশো বন্দিকে হত্যা করেছিল। আক্কা ক্রুসেডারদের জেরুজালেমের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সময় রিচার্ডের বোনের সাথে সালাউদ্দীনের ভাইয়ের বিবাহ হয় এবং দু'পক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয় (২রা নভেম্বর, ১১৯২ খ্রি.)। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উপকূলবর্তী অঞ্চল লাতিনদের এবং অভ্যন্তরীণ অঞ্চল মুসলিমদের অধীনস্থ হয়। সালাউদ্দীনের মৃত্যুর পর (১১৯৩ খ্রি.) আইয়ুবী পরিবারের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই সুযোগে ফ্রাঙ্করা বৈরুত, টিবেরিয়াস, আসকালান; এমনকি জেরুজালেমও দখল করে নেয়। তবে আত্মকলহে জর্জরিত ফ্রাঙ্করাও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দের পর মিশরীয় শাসক আল-মালিক আল-সালিহ নজম আল-দ্বীন আইয়ুব (১২৪০-১২৪৯ খ্রি.) খাওরিজমের তুর্কিদের সাহায্যে জেরুজালেম পুনঃদখল করেন।

ক্রুসেডারদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার গল্প

মিশরের মামলুক রাজবংশের চতুর্থ সম্রাট আল মালিক আল জাহির বাইবার্স (১২৬০-৭৭) এবং তার পরবর্তী শাসকেরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সালাউদ্দীন আইয়ুবীর মতো স্বপ্ন দেখতেন সুলতান বাইবার্স। ১২৬৩ থেকে ১২৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর তিনি এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। ফলে লাতিন অধিকৃত

Scanned by CamScanner

শহরগুলো ভেঙে পড়ে। ফ্রাঙ্কদের দখলে থাকা সিরিয়ার ওপরই তিনি সবচেয়ে জোরালো আঘাত হানেন। ক্রুসেডারদের নিকট থেকে এ্যান্টিয়ক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কথিত আছে, এখানে ১৬ হাজার সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এক লক্ষ সৈন্যকে বন্দি করা হয়েছিল। এ্যান্টিয়কের দুর্গ এবং গীর্জাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ্যান্টিয়কের পতনের পর আশেপাশের ছোটখাটো রাজ্যগুলোও ভেঙে পড়ে। বাইবার্সের উত্তরাধিকারী মালিক আল-মনসুর কালাউন লাতিনদের বৃহত্তম কেন্দ্র ত্রিপোলি দখল করে নেন এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালান। কালাউনের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-আশরাফ (১২৯০-১২৯৩ খ্রি.) লাতিনদের সর্বশেষ ঔপনিবেশিক আক্কা অবরোধ করেন এবং ১২৯১ সালের মে মাসে তা দখল করে নেন। আক্কাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আক্কার পতনের সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের অবশিষ্ট শহরগুলোও বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের এবং পুণ্যভূমি থেকে ক্রুসেডারদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে যায়।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ছয়

উসমানীয় সালতানাতের অধীনে ফিলিস্তিন

সুলতান মালিক আল-যাহির রুকন-আল-দীন বাইবার্স আল-বান্দুকদারী (১২৬০-১২৭৭ খ্রি.) আব্বাসীয় খলিফাদের নতুন করে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন। বাগদাদ বিপর্যয়ের সময় (১২৫৮ খ্রি.) পালিয়ে বাঁচা দামেস্কে অবস্থানরত আব্বাসীয় যুবরাজ আল মুস্তানসিরকে (শেষ আব্বাসীয় খলিফার চাচা) খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। আল-হাকিম নামক আরেকজন তরুণ আব্বাসীয় বংশের যুবরাজকে খলিফার তখতে বসান। তিনি ও তার বংশধরেরা দীর্ঘ ২৫০ বছর ধরে নামমাত্র খলিফা হয়ে বেঁচে ছিলেন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রুমের সেলজুক সুলতানদের পতনের পর এশিয়া মাইনরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। প্রায় ২০টি ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্যতম একটি রাজ্য ছিল গাজীদের সুলতান হিসেবে পরিচিত উসমান গাজীর উসমানীয় রাজ্য। এস্কিশহর, ইজনিক ও ব্রুসা অঞ্চল নিয়ে এ রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ব্রুসা ছিল এ রাজ্যের রাজধানী। উসমানের পিতা তুঘরিল ছিলেন তুর্কি দলপতি। এ বংশের দ্বিতীয় সুলতান ওরখানের সময় (১৩২৬-১৩৬২) বাইজেন্টাইন সম্রাট তৃতীয় এ্যান্ড্রোনিকাসের বাহিনীকে পরাজিত করে নাইসিয়া (১৩৩১ খ্রি.) এবং এরপর নিকোমিত্তিয়া দখল করেন। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গৃহযুদ্ধের সুযোগে ওরখান ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। ওরখান বাইজেন্টাইনদের মিত্রে পরিণত হন এবং সম্রাট কন্যা থিওডোরাকে বিবাহ করেন। তিনি জেনিসারি বাহিনী গঠন করেন এবং ইউরোপের দিকে অগ্রসর হন। এই জেনিসারি বাহিনী পরবর্তীতে ইউরোপের ত্রাস হিসেবে আবির্ভূত হয়। উসমানীয় শাসক প্রথম মুরাদের (১৩৬২-১৩৮৯) সময় এ সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং বাইজেন্টাইনের বিখ্যাত শহর এড্রিয়ানোপল (বর্তমান এডিরন)

Scanned by CamScanner

উসমানীয়দের দখলে আসে। এটি উসমানীয়দের রাজধানী শহরে পরিণত হয়। বলকান উপদ্বীপে রাজ্য বিস্তার এবং সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার রাজাদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে মুরাদ এশিয়া মাইনরে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হন। সুলতান পুত্র বায়েজিদের (১৩৮৯-১৪০২ খ্রি.) শাসনামলে সম্মিলিত খ্রিস্টানশক্তি নিকোপলিসের যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়। ফলে এশিয়া মাইনরসহ অন্যান্য অঞ্চলে তার ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ্যাঙ্গোরার যুদ্ধে (১৪০২ খ্রি.) বায়েজিদ তৈমুর লং-এর নিকট পরাজিত হয়ে বন্দি হন। তবে তার পুত্র মুহাম্মদের (১৪১৩-১৪২১ খ্রি.) নেতৃত্বে উসমানীয় সাম্রাজ্য পুনরায় ঘুরে দাঁড়ায় এবং মুহাম্মদপুত্র দ্বিতীয় মুরাদের (১৪২১-১৪৬১ খ্রি.) সময় এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার সময়েই সার্বিয়া এবং বসনিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং বহু মানুষ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। সুলতানের পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.) বাইজেন্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (১৪৫৩ খ্রি.) দখল করেন। তিনি এশিয়ার সাইনোপ, ত্রেবিজন্দ ও ক্রাইমিয়া দখল করেন। মুহাম্মদের পৌত্র প্রথম সেলিমের (১৫১২-১৫২০ খ্রি.) সময় মিশর ও সিরিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এ সময় অন্যান্য শহরের সাথে জেরুজালেমও উসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ে। মহামতি সোলায়মানের রাজত্বকালে (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) জেরুজালেমের সন্তজন সম্প্রদায়ের ধর্মযোদ্ধাদের অধিকারভুক্ত রোডস দ্বীপও উসমানীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। উসমানীয়দের বিপর্যয়কালে ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের নিজস্ব খ্রিস্টান গ্রুপগুলোকে সমর্থন দিচ্ছিল। অস্ট্রিয়ান ও ফরাসিরা ফ্রান্সিসক্যানদের জন্য প্র্যাডোমিনিয়াম বরাদ্দ করতে সক্ষম হলেও রাশিয়া উসমানীয়দের মোটা অংকের ঘুস দিয়ে অর্থোডক্সদের হাতে তুলে দেন। অবশ্য কিছুদিন পর ফ্রান্সিসক্যানরা তা ফিরে পায়। মিশর, সিরিয়া উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় মুহাম্মদের রাজত্বকালে মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশা এবং ফিলিস্তিন ও লেবাননে ইবরাহীম আলজাঞ্জার (কসাই ইবরাহীম) প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করতেন। সুলতান মহামতি সোলায়মানের মৃত্যুর পর অটোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের রথ থেমে যায়। নতুন অঞ্চল দখল তো দূরে থাক, অধিকৃত সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখাই দুরূহ হয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী প্রবেশ করে আত্মকলহ ও অবক্ষয়ের যুগে। অপরদিকে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং রাশিয়া প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে ইউরোপের 'রুগ্নমানুষ' অটোমান সাম্রাজ্যের বুকে।

Scanned by CamScanner

মহামতি সোলায়মান নির্যাতিত ইহুদিদের স্বাগত জানাতেন। এসব ইহুদিরা ভয়াবহ নিপীড়নে স্পেন থেকে (মুসলিম স্পেন ছিল জেরুজালেমের বাইরে ইহুদিদের প্রধান বসতি) হল্যান্ড, পোল্যান্ড, লিথুনিয়া ও উসমানীয় সাম্রাজ্যে পালিয়ে আসত। জেরুজালেমে অবস্থানকারী ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টের দেয়ালগুলোর আশেপাশে এবং তাদের প্রধান সিনাগগ র‍্যামব্যানে প্রার্থনা করত। সুলতান তাদের প্রাচীন কেভ সিনাগগ এবং জুইশ কোয়ার্টারের কাছে কিং হোরার্ডস টেম্পলের সহায়ক দেয়ালের পাশে ৯ ফুট রাস্তা বরাদ্দ করেছিলেন।[১৯] তবে তাদের প্রার্থনার ওপর নানা বিধিনিষেধ ছিল এবং পরবর্তীতে এখানে প্রার্থনার জন্য অনুমতি নিতে হতো। ইহুদিরা এই স্থানটিকে বলতো হা-কোটেল (দ্য ওয়াল); বহিরাগতরা বলতো ওয়েস্টার্ন বা ওয়েলিং ওয়াল (পশ্চিম দিকের দেয়াল বা কান্নার দেয়াল)। মহামতি সোলায়মান ডেভিড'স টম্ব (দাউদ আ-এর সমাধি) থেকে ফ্রান্সিসক্যানদের বহিষ্কার করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে মধ্য-ইউরোপের হ্যাবসবার্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্রিস্টান মিত্র হিসেবে ফ্রান্সিসক্যানদের পৃষ্ঠপোষক ফ্রান্সকে বেছে নেন এবং ফ্রান্সকে কিছু বাণিজ্যিক সুবিধাসহ ফ্রান্সিসক্যানদেরকে খ্রিস্টান স্থাপনাগুলোর অভিভাবকত্ব প্রদান করেন। ফলে তারা চার্চের কাছে সেন্ট স্যাভিয়র্সে সদর দফতর স্থাপন করে এবং নগরীর মধ্যেই বিশাল ক্যাথলিক নগরী তৈরি করে যা অর্থোডক্সদের মধ্যে বিরক্তের সৃষ্টি করে। মহামতি সোলায়মানের পর তার পুত্র সেলিম (১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এই মাতাল শাসকটির অন্যতম উপদেষ্টা ছিল ইহুদি ধর্মাবলম্বী যোশেপ ন্যাসি। তিনি রাজক্ষমতা কাজে লাগিয়ে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হন এবং বলতে গেলে সাইপ্রাসের রাজায় পরিণত হন। ইউরোপ ও জেরুজালেমে নির্যাতিত ও নিঃস্ব ইহুদিদের রক্ষায় এত তৎপর ছিলেন যে, অনেকে তাকে মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা) ভাবতে শুরু করেন।

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের স্থানীয় আরবরা বিদ্রোহ করে গভর্নরকে হত্যা করে নগরীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে বিদ্রোহীদেরও পরবর্তীতে পরাজিত ও বহিষ্কার করা হয়। এ সময় জেরুজালেমে আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্যাথলিকদের নির্মূল এবং খ্রিস্টধর্মীয় স্থাপনাগুলোর নিয়ন্ত্রণ লাভ। প্র্যাডোমিনিয়াম ক্যাথলিকদের রক্ষায় অটোমান সুলতানগণ মাত্র ২০ বছরে ৩৩টি ডিগ্রি ইস্যু করেন এবং মাত্র

[১৯] সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

Scanned by CamScanner

সাত বছরে ছয়বার প্র্যাডোমিনিয়াম হাত বদল হয়। তবে এই সময়টাতে ইহুদিরা শান্তিতে বসবাস করছিল। মিশরীয়, পূর্বইউরোপীয় ইহুদিরা এ সময় জেরুজালেমে অবাধে আসত। তারা চারটি 'সিনাগগ' নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থও যোগাড় করেছিল। তবে আলেমদের অনুরোধে জেরুজালেমের মুসলিম গভর্নর তাদের র‍্যামব্যান সিনাগগটাও বন্ধ করে সেটাকে গুদাম ঘরে পরিণত করেন। মাঝে মাঝে ফিলিস্তিনে ইস্তাম্বুলের গভর্নর এত নির্যাতন চালাত যে, কৃষকেরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হতো। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের নতুন গভর্নর বিদ্রোহীদের হত্যা করে তাদের মাথাগুলো দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। ১৮ শতাব্দী জুড়ে উসমানীয়দের ক্ষমতা এবং গৌরব কমতে থাকে এবং স্বাধীনতা প্রত্যাশী বিদ্রোহও বাড়তে থাকে। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় জেরুজালেমেও শাইখ জাহির আল উমরের (১৭৫০-১৭৭৫ খ্রি.) নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি টিবেরিয়াম দখল করেন এবং অন্যান্য শহরের ওপরও কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আক্কাও দখল করেন। রুশ সৈন্যদের সাহায্যে তিনি সিডনও (১৭৭২ খ্রি.) দখল করেন। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে উমরের সঙ্গে জোট গঠন করে মিশরীয় জেনারেল আলী বে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। তবে লেবাননের শিহাবী আমীররা তার রাজধানী আক্রমণ করে এবং তাকে হত্যা করে। এরপর জেরুজালেমের হাল ধরেন আহ্‌মেদ আল-জাফর (সাবেক বসনীয় খ্রিস্টান)। উসমানীয় সুলতানগণ তাকে সিরিয়া এবং লেবাননের শাসক হিসেবে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। তার সময়ে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৯৯, ২রা মার্চ) ফিলিস্তিনে হামলা করেন এবং জাফা অবরোধ করেন। এটি ছিল জেরুজালেম থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে। জাফায় ফরাসি বাহিনী নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে একরের (Acer) দিকে রওয়ানা দেয়। নেপোলিয়ান একর দখল করে রামাল্লায় পৌঁছান এবং জায়নপন্থী ইহুদিদের জন্য একটি ঘোষণা ইস্যু করেন। এতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ডেটলাইন দেওয়া হয়– জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স, জেরুজালেম, ২০শে এপ্রিল, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

ঘোষণায় নেপোলিয়ন ইহুদিদের বলেন, 'হে নির্বাসিতরা! খুশিতে জেগে উঠে পিতৃভূমি ইসরায়েলের দখল নাও। তরুণ সেনাবাহিনী জেরুজালেমকে আমার সদর দফতর বানিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যে দামাস্কাসে সরে যাবে, ফলে তখন তোমরা জেরুজালেমে শাসক হিসেবে থেকে যেতে পারবে।'[২০]

[২০]সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩।

Scanned by CamScanner

সরকারি ফরাসি গেজেট লিখেছিল, 'নেপোলিয়ন প্রাচীন জেরুজালেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক সংখ্যক ইহুদিকে সশস্ত্র করেছেন।'[১১]

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২১শে মে ১২০০ সৈন্য নিহত ও ২৩০০ সৈন্য আহত বা অসুস্থ রেখে নেপোলিয়ন মিশরের দিকে পিছু হটা শুরু করেন। জাফাতেও ৮০০ অসুস্থ ফরাসি সৈন্য পড়ে ছিল। নগরীর গভর্নরের নেতৃত্বে জেরুজালেমের দুই হাজার অশ্বারোহী পিছু হটতে থাকা ফরাসি সৈন্যদের ধাওয়া করে নাজেহাল করে। নাবলুসের কৃষক যোদ্ধারাও জাফায় ঢুকে পড়ে। জেরুজালেমের খ্রিস্টানেরা বিশেষ করে ক্যাথলিকরা মুসলিম প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে মারাত্মক বিপদে পড়ে। তবে গণহত্যা থেকে বেঁচে যায়। সুলতান তৃতীয় সেলিম জেরুজালেমের আহমাদ আল-হাফরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন। তাকে মিশর ও দামাস্কাস ছাড়াও স্বীয় জন্মভূমি বসনিয়ারও পাশা নিযুক্ত করেন। তিনি গাজার পাশাকে পরাজিত করে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর পর ফিলিস্তিনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। দুর্দশাগ্রস্ত জেরুজালেম দখল করে নিতে পাশা ও ফিলিস্তিনি যাযাবর কৃষকেরা প্রায়শই বিদ্রোহ করত। তাদের দমাতে ছুটে আসতে হতো দামাস্কাসের পাশাকে।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর হলি সেপালচরের দ্বিতীয় তলায় আর্মেনিয়ান গ্যালারিতে আগুন ধরে যায় এক আর্মেনিয়ান কর্মচারীর স্টোভ থেকে। যীশুর সমাধি ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রিকেরা অগ্নিকাণ্ডের জন্য আর্মেনীয়কে দায়ী করছিল এবং তারা এই সুযোগে চার্চে তাদের অবস্থান সুসংহত করে।

উসমানয়ীদের দুর্বলতার দিনে রাশিয়া, পোল্যান্ড, প্রুশিয়া ও জার্মান, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে মিশনারীরা মধ্যপ্রাচ্যে আসত এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা করত। সকল মিশনারী দলকে স্বীয় সরকার প্রচুর অর্থবিত্ত প্রদান করত। ফলে তারা স্ব-স্ব সরকারের পক্ষে বিবাদেও লিপ্ত হতো। তাছাড়া ফরাসিরা ছিল রোমান ক্যাথলিক এবং রাশিয়া ছিল অর্থডক্স। আবার আর্মেনীয়গণ রাশিয়ান এবং ইংল্যান্ডের মিশনারীদের সহ্য করতে পারত না। তবে মধ্যযুগ থেকে ল্যাটিন ধর্মযাজকগণ জেরুজালেম, বেথেলহেম এবং নাযারেথের তীর্থস্থানগুলোর তত্ত্বাবধান করত। দুর্বল উসমানীয় সুলতান ১৭৪০ সালের Capitulation (রক্ষাচুক্তি) অনুযায়ী উক্ত তীর্থস্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ফরাসিদের প্রদান করেন। পাশাপাশি বেথেলহামের প্রধান গির্জার প্রধান

[১১]প্রাগুক্ত।

Scanned by CamScanner

ফটকের চাবিও তাদের দেওয়া হয়। ফলে অপরাপর খ্রিস্টান ধর্মমতের মিশনারীদের মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, অর্থডক্সরা ইতঃপূর্বে উক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করত। অর্থাৎ হলি সেপালচর নিয়ন্ত্রণ করত। এরা ফরাসি নিয়ন্ত্রণ মানতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের কুচুক কাইনারজীর সন্ধির ফলে, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই স্বাক্ষরিত চুক্তিতে (কুচুক কাইনারজীর) উসমানীয় সুলতান রাশিয়ানদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'রাশিয়ার সকল খ্রিস্টান প্রজাকে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। সুলতান ঐ সকল তীর্থযাত্রীর ওপর কোনো প্রকার কর ধার্য করবে না। তীর্থযাত্রীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুলতান আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এরপর থেকে রোমান ক্যাথলিক তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কমে যায় এবং রাশিয়ান তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। ফলে এ অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রভাবও কমে আসে। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে হলি সেপালচর (Holy Sepulchre) অগ্নিদগ্ধ হলে অর্থডক্স খ্রিস্টানরা তা মেরামত করে। এটা ক্যাথলিকরা প্রত্যাশা করেনি। ফলে অর্থডক্স ও ক্যাথলিকদের মধ্যে মারাত্মক দাঙ্গা বাঁধে। এরপর থেকে রাশিয়া মনোনীত সাইরিল (Cyril) জেরুজালেমে রাশিয়ান যাজক হিসেবে (১৮৪৩ খ্রি.) অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে পোপ পাইয়াস (১১শ) ল্যাটিন যাজককেও জেরুজালেমে অবস্থান করে অর্থডক্স যাজকের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আদেশ দেন (১৮৭১ খ্রি.)।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় সাত

ইহুদি জাতির একটা রাষ্ট্র দরকার

যীশু খ্রিস্টের হত্যার জন্য রোমান ক্যাথলিকরা ইহুদিদের দায়ী করে থাকে। এমনকি খ্রিস্টানদের কোনো কোনো সম্প্রদায় পুরো ইহুদি জাতিকে যীশু খ্রিস্টের হত্যার জন্য দায়ী করে।[২২] ধর্মীয় এই চেতনাই মূলত ইহুদি বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। ইহুদিরাও খ্রিস্টানদের তাদের জাতশত্রু বলে মনে করত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্লেগে ৩ কোটি ৪০ লাখ লোক মারা যায়। আজিমেত নামে এক ইহুদি স্বীকারোক্তি দেয়, সে বিভিন্ন এলাকার কূপে প্লেগের জীবাণু ঢেলে দিয়েছে। এরপর থেকে ইহুদিদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। অনেক সময় ইহুদিদের সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো এবং নিম্ন শ্রেণির পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হতো। মূলত সুদী কারবারে ইহুদিদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল। অনেক সময় তাদের খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করতে দেওয়া হতো না। ফলে তারা লোকালয়ের বাইরে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করত। কোনো কোনো দেশে তাদের পৃথক পোশাক এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ব্যাজ পরতে বাধ্য করা হতো। প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডে ইহুদিদের ওপরও হামলা করা হয় এবং তৃতীয় ক্রুসেডে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট এক ডিগ্রি জারি করেন। ফলে ইউরোপ থেকে পাইকারিহারে ইহুদিদের বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স থেকেও বিভিন্ন শাসক ইহুদিদের বহিষ্কার করে এবং তাদের অর্থলগ্নিকারীদের ওপর করারোপ করে। ১২৯০ সালের পর ইংল্যান্ডে সমস্ত ইহুদিকে হত্যা অথবা বহিষ্কার করা হয়েছিল। স্পেনের ইসাবেলা ও ফার্দিনান্ড সাধারণ ডিগ্রি জারি করায় সমস্ত ইহুদি উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং ফিলিস্তিনে পালিয়ে যায়। প্রুশিয়া, রাশিয়া,

---

[২২]মুসলমানগণ এটা বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ সপ্তম আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি যথাসময়ে আবারও পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

Scanned by CamScanner

রুমানিয়া, পোল্যান্ড, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ইহুদি নিধন ও ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং হাজার হাজার ইহুদি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ১৯১৯-১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, কর্নেল, বোস্টন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদি ছাত্র ভর্তি রোধে নানা রকম শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়।

জার্মান সাম্রাজ্যে (১৮৭১-১৯১৪ খ্রি.) মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের মতো ছিল ইহুদি। তবে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-গবেষণা, শিল্প ও সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা বেশ অগ্রসর ছিল। খ্রিস্টানদের সাথে মতপার্থক্য কমে আসছিল এবং ইহুদিদের মধ্যে জার্মান জাতীয়তাবোধের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ইহুদিরাও ধীরে ধীরে জার্মান সমাজের একজন হয়ে উঠছিল।

জার্মানিতে ইহুদি বসতি প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন। প্রথম দিকে তারা বিভিন্ন কাজকর্ম করলেও পরবর্তীতে মহাজনী কারবারে যুক্ত হয়ে পড়ে। রোমান আমলেও তারা মোটামুটি ভালোই ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রসার লাভ করে। এই সময়টাতেও ইহুদিরা অনেকটা স্বাধীনভাবে বসবাস করত। তবে তারা যে সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র বজায় রেখে চলত, সেটা এই সময়ও বজায় ছিল। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকলে ইহুদিদের ওপর নানাবিধ চাপও বাড়তে থাকে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ইহুদিদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

উনিশ শতকের পূর্বে ইহুদি বিদ্বেষ ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক। খ্রিস্টান-শাসিত ইউরোপে ইহুদিরা বিভিন্নভাবে ধর্মীয় বিদ্বেষ, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হতো। ধর্ম পালনে বাধা, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, দেশ থেকে বিতাড়ন ইত্যাদি নির্যাতন ইহুদিদের ওপর চালানো হতো। শিল্পবিপ্লবের পর ইহুদিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে এ সময় ইহুদিদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষও দেখা দেয়। এই জাতিগত বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, হিটলারের নাৎসি দল শাসিত জার্মানিতে। ইহুদি-বিরোধী এই জাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের দায়ও ইহুদিদের ওপর চাপিয়ে দিতে তারা বিভিন্ন অত্যাচার এবং নিধনমূলক আইন-কানুন প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে এনেছিল ইহুদিরাই। ইংল্যান্ড যুদ্ধের শুরু থেকে নৌবহরের সাহায্যে জার্মানিকে অবরুদ্ধ করে। ফলে জার্মানি

Scanned by CamScanner

সাবমেরিনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের জাহাজসমূহকে আক্রমণ করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে লুসিটোনিয়া ও এরাবিক নামক দুটি ইংরেজ জাহাজ সাবমেরিনের সাহায্যে জার্মানি ধ্বংস করলে জাহাজ দুটিতে অবস্থানরত বেশ কয়েকজন আমেরিকার নাগরিক মারা যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে জার্মানির সাথে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি কর্তৃক ফ্রান্সের যাত্রীবাহী জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হলে এখানেও কয়েকজন আমেরিকান প্রাণ হারায়। ফলে জার্মানি এবং আমেরিকার মধ্যে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আমেরিকা কর্তৃক মিত্রবাহিনীর প্রতি সহানুভূতি ও আর্থিক লেনদেন জার্মানি সুনজরে দেখেনি। জার্মানি ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিতে থাকে। ফলে জার্মান-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে জার্মানি যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়ে দিলে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে জার্মানি কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বিপর্যয়ের মুখে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের মূলে ছিল ইহুদি অফিসাররা। ফলে এ যুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের জন্য জার্মানরা ইহুদিদের ছাড়া আর কাউকে দায়ী করেনি। হিটলারের মনোভাবও ছিল তাই। যুদ্ধ শেষে বহু জটিল সমস্যা সমাধানার্থে অনেক চুক্তি ও সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এসবের মধ্যে ভার্সাই সন্ধি অন্যতম। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী জার্মানির প্রাক্তন কলোনিসমূহ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ম্যান্ডেট হিসেবে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জার্মান পায়। সন্ধিতে বলা হয়, জার্মানি প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের স্বার্থে জার্মানির নৌ ও সামরিক শক্তি দুর্বল করতে হবে এবং জার্মানির নিয়ন্ত্রণে যা আছে, তাও সীমিত করতে হবে। শান্তিচুক্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, মিলিটারি ডিপো ও অফিসারসহ জার্মান সেনাবাহিনী কোনোক্রমেই এক লাখের বেশি হবে না। কোনোক্রমেই নৌ, সামরিক ও আকাশশক্তি থাকবে না। বৃহৎ জার্মান সৈন্যবিভাগ বিলুপ্তি করতে হবে। অস্ত্র বারুদ ও যুদ্ধসামগ্রীসমূহের উৎপাদন কঠোরভাবে সীমিত করতে হবে এবং যুদ্ধসামগ্রীর উৎপাদন ও আমদানি করতে পারবে না। বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বিলুপ্ত করতে হবে। জার্মানির বিদ্যমান দুর্গসমূহ অস্ত্রহীন ও ভেঙে দিতে হবে এবং কোনোপ্রকার দুর্গ নির্মাণ করতে পারবে না। জার্মানির সেনাবাহিনী কোনো প্রকার সামরিক মহড়া পরিচালনা করতে পারবে না। জার্মানির নৌ-বাহিনী কেবলমাত্র ৬টি যুদ্ধজাহাজ, ৬টি হালকা ক্রুজার, ১২টি ডেস্ট্রয়ার এবং ১২টি

Scanned by CamScanner

টর্পেডো বোটের সাহায্যে গঠিত হবে। যুদ্ধজাহাজ তৈরি বা সংগ্রহ করতে পারবে না। সাবমেরিন ধ্বংস করতে হবে এবং ব্যবসার জন্যও সাবমেরিন উৎপাদন করতে পারবে না। জার্মানি মিত্রশক্তির মিত্রদের বেসামরিক লোকদের সমস্ত ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দেবে এবং আকাশ, নৌ ও স্থলযুদ্ধে তাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতেও জার্মানি বাধ্য থাকবে।

এছাড়া আরও বেশ কিছু অপমানজনক শর্ত জার্মানির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভার্সাই সন্ধি বাস্তবায়নের পক্ষে বলা হয়, সন্ধি কার্যকর হওয়ার দিন থেকে ১৫ বছরের জন্য রাইন নদীর পশ্চিম তীরের অঞ্চল (খনিজসমৃদ্ধ) মিত্রশক্তি দখল করবে। সন্ধির শর্তাবলি লিখিত হলে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে জার্মান প্রতিনিধিদের ডেকে এনে চুক্তিটি উপস্থাপিত হয় এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। তাদের বলা হয়, তারা মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের সাথে মৌখিক আলোচনারও সুযোগ পাবে না। সন্ধিতে বলা হয়েছিল, বিদেশি সেনাবাহিনী জার্মানিতে অবস্থান করবে এবং এর ব্যয়ভার জার্মানি বহন করবে। সামরিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী মিত্র কমিশনসমূহের খরচ জার্মানি বহন করবে। অনির্দিষ্ট যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানি বাধ্য থাকবে। শুধু তাই নয়, এই চুক্তির ফলে জার্মানি ২৫০০ বর্গমাইল অঞ্চল হারায় এবং লোকসংখ্যা ৬০ লাখ কমে যায়। খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহ জার্মানির হাতছাড়া হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো জার্মানি জুড়ে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। সামরিক শক্তির বিপর্যয়, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, বিশৃঙ্খলা ও খাদ্যভাবে জার্মানদের সকল ক্ষোভ কাইজারের ওপর গিয়ে পড়ে এবং রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় ক্ষতিপূরণে বাধ্য করার জন্য ফ্রান্স বেলজিয়ামের সাথে জার্মানির খনিসজমৃদ্ধ অঞ্চল রূঢ় দখল করে। এ অঞ্চলে ধর্মঘট শুরু হয়। এতে জার্মানির শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জার্মান মুদ্রার মান নিচে নেমে যায়। এই হতাশাজনক অবস্থায় উত্থান ঘটে নাৎসি দলের। নেতা এ্যাডলফ হিটলার মিউনিখে বিভিন্ন জনসভায় ধনতন্ত্র, ফ্রান্স ও ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তাবলির তীব্র সমালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করে জনমতকে উস্কে দেন। জার্মানির যুবসমাজ, বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণি হিটলারের কর্মসূচি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং হিটলার চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত

Scanned by CamScanner

হন। এই নাৎসি আন্দোলন ইহুদি বিদ্বেষী ব্যাপক প্রচারকার্য চালিয়েছিল, যা তাদের সফলতার অন্যতম কারণ। কেননা, জার্মানরা ইহুদিদেরকে বিজাতি ও বিদেশি বলে মনে করত। জার্মানিতে ইহুদিরা ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও পুঁজিপতি সম্প্রদায়। তাছাড়া জার্মান ব্যবসায়ীগণ শিল্পপতি ও বণিকশ্রেণি ইহুদিদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করত। জার্মানির দুরবস্থার জন্য জার্মানগণ ইহুদিদেরকেই দায়ী করে। আর নাৎসি নেতা হিটলার অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাল্যকাল এখানে অতিবাহিত করেন। উল্লেখ্য যে, এই অস্ট্রিয়াতেও ইহুদি-বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করেছিল এবং হিটলারের ওপরও এর প্রভাব পড়েছিল। তাই বাল্যকাল থেকেই হিটলার ছিলেন চরম ইহুদি বিরোধী। তাছাড়া নাৎসি দলের অন্যতম আদর্শ ছিল জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা। অর্থাৎ জার্মান জাতিকে অ-জার্মান জাতির প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে। ইহুদিদের জার্মানরা কখনও তাদের অন্তর্ভুক্ত জাতি বলে মনে করত না, তাই নাৎসি দল ইহুদিদের জার্মানি থেকে বিতাড়িত করার নীতি গ্রহণ করে। জার্মানগণ আর্যজাতি থেকে উদ্ভূত এবং এই জার্মান রাষ্ট্রে অ-জার্মান জাতির স্থান নেই– এটাই ছিল হিটলারের মতবাদ। ইহুদিরাও জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতাবাদে অধিক আস্থাবান ছিল। তাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ইহুদিদের ৫০০০ মার্ক মূল্যের অতিরিক্ত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। সরকারি চাকরি থেকে তাদের বহিষ্কার করেন এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন। আইন ব্যবসা তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়। হাসপাতাল থেকে ইহুদি চিকিৎসক ও নার্স এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইহুদি শিক্ষকদের বিতাড়িত করা হয়। ঘোষণা করা হয়, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫% এর অধিক ইহুদি ছাত্র ভর্তি করা চলবে না। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর হাজার হাজার ইহুদিকে গ্রেফতার করা হয় এবং বহু ইহুদিকে হত্যা করা হয়। ইহুদিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লুণ্ঠন করা হয় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক ইহুদি (আইনস্টাইনসহ) দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এ সময় ইহুদি কম্যুনিটি জার্মানির এসব নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তারা জার্মানপণ্য বর্জনের জন্য ডাক দেয় এবং হিটলার সরকার উৎখাতের জন্য আহ্বান জানায়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ আমেরিকান জিউইশ কংগ্রেস মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে এক বিশাল বিক্ষোভ প্রতিবাদের ডাক দেয়। এতে প্রায় ২৩ হাজার ইহুদি অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ প্রতিবাদ

Scanned by CamScanner

অনুষ্ঠিত হয় এবং জার্মানপণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক সিটির দোকানগুলোতে জার্মানপণ্য বর্জন শুরু হয়। পুরো বিশ্বব্যাপী জার্মানির বিরুদ্ধে ইহুদিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় জায়নবাদীরা ব্রিটেন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সদর দফতর স্থানান্তরিত করে এবং আমেরিকার প্রভাবশালী দুই দল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মার্কিন সরকারের কার্যকলাপে ইহুদি ঘেঁষা মনোভাব প্রকাশ পায়।

ইহুদি নেতৃবৃন্দ জার্মানপণ্য বর্জনের ডাক দিলেও হিটলার তার ইহুদি বিদ্বেষী নীতি অব্যাহত রাখেন। জার্মান নাৎসি বাহিনী পূর্ব-ইউরোপের কিছু এলাকা দখল করে এবং ইহুদিদের ধরে এনে গ্যাটোতে (এক ধরনের বস্তি, সেখানে গাদাগাদি করে মানুষ রাখা হতো) রাখা হতো। এসব গ্যাটোতে মানুষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মাঝে মানবেতর জীবনযাপন করত। তারপর গ্যাটো থেকে তাদের মালবাহী ট্রেনে করে শত-শত মাইল দূরে বন্দিশিবিরগুলোতে নিয়ে যেত। এভাবে অনেক মানুষ ট্রেনেই মারা যেত। নিরাপদ হেফাজতে নেওয়া, রাষ্ট্রদ্রোহী আচরণ প্রতিহতকরণ প্রভৃতি অজুহাতে মানুষদের বন্দিশিবিরে আটকে রাখা হতো। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ নোরা শহরের একটি বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বন্দিশিবির স্থাপন করা হয় এবং এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বন্দিশিবিরের মানুষদের চাবুকাঘাতসহ বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হতো। এসব বন্দিশিবির তারকাঁটা, নজরদারি ফাঁড়ি ও সেনাশিবির দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অনেক বন্দিশিবিরের লোকজনকে শ্রমিক হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। ২৭টি প্রধান বন্দিশিবির ও ১১০০টি গৌণ বন্দিশিবির ছিল। এসব বন্দিশিবিরে প্রায় ১৬ লক্ষ ব্যক্তিকে আটকে রাখা হয়েছিল– যার মধ্যে ১১ লক্ষ বন্দি মারা যায়। অনেকের মতে, ২০ থেকে ২৮ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। অনেকে মনে করেন, আউস্কা ভিটজ গ্যাস প্রকোষ্ঠে আরো ১০ লক্ষ বন্দিকে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। এসব নিহতদের প্রায় ৯০% ইহুদি। ইহুদিরা এটাকে হলোকাস্ট (Holo caust) বলে থাকে– যা ছিল ইহুদি প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান।

নাৎসি জার্মানি এবং ইতালির ফ্যাসিস্ট সরকারের সহায়তায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় স্বাধীন ক্রোয়েশিয়া। এখানেও স্থাপিত হয় কয়েকটি বন্দিশিবির। এসব বন্দিশিবিরও ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত 'যুক্তরাষ্ট্র

Scanned by CamScanner

ইহুদি গণহত্যা স্মৃতি যাদুঘর'-এর হিসাব মতে, ক্রোয়েশিয়াতেই ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৭৭, ০০০ থেকে ৯৯,০০০ বন্দিকে হত্যা করা হয়। সব মিলিয়ে এসব হলোকাস্টে ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যার অভিযোগ আনা হয়। আবার অনেকের মতে, সংখ্যাটা নব্বই লক্ষ থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ২৯-৩০শে সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের ৩৩,৭৭১ জন ইহুদিকে হত্যা করে, যা ববি ইয়ার (Babi Yar) হত্যাকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। আবার অনেকেই এগুলো 'আজগুবি' তথ্য বলে প্রচার করে। অনেকের মতে, এ সমস্ত নির্মূল শিবিরে হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে লুকায়িত করার জন্য নাৎসি বাহিনী ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। বন্দিশিবিরগুলো ভেঙে ফেলা হয়, সমস্ত নথিপত্র ধ্বংস করা হয়, গণকবরগুলো খনন করে দেহাবশেষ সরিয়ে ফেলা হয়।

হলোকাস্টের ব্যাপারে বিভিন্ন মতগুলো হচ্ছে, জায়নবাদীরা প্রথমে নাৎসি সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। কিন্তু পরে তারা উপলব্ধি করে যে, ইহুদি-বিরোধী হিটলারই ইহুদিদের জায়নবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এটাই ছিল তথাকথিত 'ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট' বা স্থানান্তর চুক্তির ভ্রূণ। ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে জার্মান ইহুদিদের স্থানান্তরের লক্ষ্যে নাৎসি সরকার ও জায়নবাদী ইহুদিদের মধ্যে চুক্তি হয়। ঐতিহাসিক এডউইন ব্ল্যাক বলেন, 'অধিকাংশ ইহুদি ফিলিস্তিনে পালিয়ে যেতে চায়নি। কিন্তু নাৎসি জার্মানিতে জায়নবাদী আন্দোলনের প্রভাবে ইহুদিরা জার্মানি থেকে ফিলিস্তিনে পালিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখতে পায়।[২৩]

কথিত হলোকাস্টের জন্য জার্মানিকে দায়ী করা হয় এবং ইহুদিদের জন্য ৬ হাজার ৮ শ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। পোল্যান্ডের অসউইচ গ্যাস চেম্বারে ৪০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ৪০ লাখ নয়, ১ লাখ ৩৫ হাজার থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার লোক মারা গেছে। মৃত্যুবরণকারীদের সাথে কিছু অন্য ধর্মের লোকও ছিল। এসব লোক অনাহার ও রোগব্যাধিতে মারা গেছে। গ্যাস চেম্বারে হত্যার দাবি আষাঢ়ে গল্প। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী দেশগুলোর সহানুভূতি আকর্ষণে হলোকাস্টে নিহতদের সংখ্যা বাড়িয়ে উল্লেখ করা হতো।[২৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্লভ বোমা তৈরির উপকরণ 'কৃত্রিম ফসফরাস' তৈরি

---

[২৩]সাহাদত হোসেন খান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ট্রাজেডি (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৬), পৃ. ২৮১।
[২৪]প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০-২৬১।

Scanned by CamScanner

করতে সক্ষম হন ইহুদি বিজ্ঞানী ড.হেইস ওয়াইজম্যান। ড.ওয়াইজম্যান এর প্রতিদান স্বরূপ ইহুদি জাতির আবাসভূমি হিসেবে 'ফিলিস্তিন'কে প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতা প্রদানের অঙ্গীকারে প্রায় ৩০ বছর (১৯১৮-১৯৪৮) দেশটিকে নিজেদের অধীনে রাখে ব্রিটেন। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইহুদিদের আগমন ঘটে ফিলিস্তিনে। ব্রিটিশ সহায়তায় এইসব ইহুদিরা গড়ে তুলেছিল 'হাগানাহ', 'ইরগুন' ও 'স্ট্যার্ন গ্যাং' নামে বহু সন্ত্রাসী সংগঠন। এরা হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, ভীতি সৃষ্টি এবং নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপের মাধ্যমে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় আট

জায়নিস্ট মুভমেন্ট : পুণ্যভূমিতে আলেয়ার ঢেউ

জায়নবাদ[২৫] শব্দটি নতুন কোনো শব্দ নয়। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেও শব্দটি সুপরিচিত ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বুদাপোস্টে জন্মগ্রহণকারী সাংবাদিক হারৎজেল[২৬]-এর কৃতিত্ব হলো– তিনি অতিপ্রাচীন এই ভাবাবেগটির রাজনৈতিক অভিব্যক্তি এবং সাংগঠনিক রূপ দিয়েছেন। ইউরোপীয় দেশসমূহে ইহুদি-বিরোধী মনোভাব তাকে বিচলিত করে। ফরাসি দেশেও

---

[২৫]জেরুজালেমে দাউদ (আ) ও তার উত্তরাধিকারীদের মন্দির ও প্রাসাদ যেখানে অবস্থিত ছিল, সেই অনতিউচ্চ পাহাড় জায়ন নামে পরিচিত। একে ইহুদিদের ধর্মীয় সংস্কৃতি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়।

[২৬]থিওডোর হারৎজেল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২রা মে হাঙ্গেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ভিয়েনা সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং পরে Neus Frie Presse-এর সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি বেশকিছু নাটক রচনা করেন। তার প্রাথমিক জীবনে ইহুদি ধর্মের তেমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তৃতীয় ফরাসি বিপ্লবের সময় (১৮৯৪-১৯০৬) একজন ইহুদি ফরাসি আর্মি ক্যাপ্টেনকে জার্মানির পক্ষে গোয়েন্দাবৃত্তি করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এটা হারৎজেলের মনে গভীর রেখাপাত করে। হারৎজেলের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইহুদিদের অবশ্যই ইউরোপ ত্যাগ করা উচিত। কেননা, পাশ্চাত্য বিশ্বের সেমেটিক বিদ্বেষী মনোভাব মুছে ফেলা সম্ভব নয়; সে কারণে ইহুদিদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমি দরকার। তিনি তার ডায়েরিতে ১৮৮৫ সালের জুনে লেখেন, 'In Paris, as I have said, I achieved a freer attitude toward anti-semitism.' এরপর তিনি নিজেকে জায়নিস্ট আন্দোলনে নিয়োজিত করেন। এরপর থেকে তিনি ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য ব্যাপক লেখালেখি শুরু করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি লেখেন Der Judenstant (The State of Jews) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি জোর দেন ইহুদিদেরকে ইউরোপ ত্যাগ করে ফিলিস্তিনে যাওয়ার ব্যাপারে। তার এই ধারণা জায়নবাদীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে জায়নিস্ট কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং হারৎজেল এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ সালে তিনি প্রথম জেরুজালেম পরিদর্শন করেন। ১৯০৪ সালের ৩রা জুলাই তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার একদিন পূর্বে বলেন, 'Greet Palestine for me I have my heart's blood for my people.'

Scanned by CamScanner

ইহুদি-বিরোধী মনোভাবের গভীরতা তাকে ভাবিয়ে তোলে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তিনি দ্য জুইশ স্টেট-এ লেখেন, 'ফিলিস্তিন আমাদের চির-অমলিন ঐতিহাসিক আবাসভূমি। ম্যাকাবিয়া আবার উঠবেই। আমরা একদিন অবশ্যই স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের মাটিতে বাস করব। আমাদের বাড়িতে শান্তিতে মরব।' তার মতে, 'নিজেদের আবাসভূমি ছাড়া ইহুদিরা কখনো নিরাপদে থাকবে না।' ইউরোপের নতুন জাতীয়তাবাদ বহিরাগত ও কসমোপলিটন লোকদের প্রতি বর্ণবাদী বিদ্বেষভাব উস্কে দিয়েছিল। একই সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতা ইহুদিদেরও উদ্দীপ্ত করেছিল। সম্রাট নেপোলিয়ন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস্‌রা ইহুদিদের জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করতেন। পোলিশ ও ইতালির জাতীয়তাবাদীরাও তাই ভাবত। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের জায়নবাদীরাও একই চিন্তা করত। এইসব চিন্তাভাবনায় সম্মুখ থেকে নেতৃত্ব প্রদান করত গোঁড়া রাব্বিরা। প্রুশিয়ার আশকেনাজি রাব্বি জাভি হিরশচ ক্যালিশচর ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের জন্য ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে রথচাইল্ড ও মন্টেফিওরিদের নিকট আবেদন করে। সিকিং নামক আরেক জায়নিস্ট 'জায়ন' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে। কার্ল মার্ক্স-এর কমরেড মোজেজ হেজ 'রোম অ্যান্ড জেরুজালেম: দ্য লাস্ট ন্যাশনাল কোয়েশ্চন' নামক গ্রন্থে ফিলিস্তিনে একটি সমাজবাদী ইহুদিসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ১৮৬২ সালে। বন-এ জন্মগ্রহণকারী হেস ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রুশিয়া সরকার কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্যারিসে বসবাস করতেন। হারৎজেলের সমসাময়িক চিকিৎসক ওডেসার ফিলিস্তিনে কৃষি বসতি স্থাপনে ইহুদিদের উজ্জীবিত করে। এভাবে হারৎজেলের 'দ্য জুইশ স্টেট' প্রকাশের পূর্বেই ২৫ হাজারেরও বেশি ইহুদি ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। পারস্য, ইয়েমেন, বোখারা প্রভৃতি অঞ্চলের ইহুদিরাও ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। তবুও হারৎজেল বিশ্বাস করত– 'জায়নবাদ' প্রতিষ্ঠিত হবে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয়; সম্রাটদের অনুমোদন এবং পুঁজিপতিদের অর্থায়নে। তার চিন্তা ছিল– ইহুদি রাষ্ট্রটি হবে জার্মানভাষী। আমরা অতি রাষ্ট্রিক জেরুজালেম গড়ে তুলব, যা কারো একার না হয়ে সবার হবে এবং সম্মিলিতভাবে সব ধর্মের লোকেরাই এর পুণ্যময় স্থানগুলোর অধিকারী হবে। আমরা এখানে তিন লক্ষ ইহুদি আনতে পারলেই পুরো ইসরায়েল আমাদের হয়ে যাবে। তাই সে কাইজারের দিকে ঝুঁকছিল এবং সেই সাথে জার্মানির ইহুদি শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। ইহুদি জাহাজ মালিক আলবার্ট ব্যালিনের সঙ্গেও যোগাযোগ করে, যদিও লোকটি ছিল ইহুদি-বিরোধী। আলবার্ট বলত, 'ইহুদিরা আমাদের রাজ্যের পরজীবী এবং জার্মানিতে পঙ্কিলতা ও দুর্নীতির বিস্তার ঘটাচ্ছে।'

Scanned by CamScanner

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ইহুদিদের সংস্থা Alliance Isrelite Unverselle জাফায় একটি অত্যাধুনিক কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করে। জার্মান ইহুদিরা জেরুজালেমে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এ সময় প্রতিক্রিয়াশীল তৃতীয় আলেকজান্ডার (১৮৮১ খ্রি.) রাশিয়ায় যে ইহুদি-বিরোধী অভিযান শুরু করে, তা পূর্ব-ইউরোপের দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ইহুদি আমেরিকার দিকে ধাবিত হয় আর কিছু সংখ্যক ইহুদি ফিলিস্তিনের দিকে গমন করে। রাশিয়া, রুমানিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স থেকে ফিলিস্তিনে যে ইহুদিদের আগমন ঘটত, এটাকে তারা 'আলেয়া' বলত। (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট পাঁচটি আলেয়ায় ইহুদিরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছিল)।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ প্রথম জায়নবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হারৎজেল, বিচারপতি লুই ব্রান্ডাইস ও ড. হাইম ওয়াইজম্যানের[৭] ন্যায়

[৭]১৮৭৪ সালের ২৭শে নভেম্বর রুশ সাম্রাজ্যের মোটালে (বর্তমান বেলারুশ) জন্মগ্রহণ করেন ড. হাইম ওয়াইজম্যান (Dr. Chaim Weizmen)। ১৫ জন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়তম এবং বাল্যকালে ইহুদি স্কুলে পড়েছেন। এইসব স্কুলগুলোতে হিব্রুও শিক্ষা দেওয়া হতো। ১১ বছর বয়সে তিনি পিনাস্কের মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এই সময় জায়নিস্ট মুভমেন্টে যোগদান করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এই বছরই তিনি রসায়ন পড়তে জার্মানি গমন করেন। এ সময় তিনি অর্থডক্স ইহুদি বোর্ডিং স্কুলে হিব্রু ভাষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বার্লিনে আসেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন জায়নবাদী বুদ্ধিজীবী সার্কেলে যোগদান করেন। সুইজারল্যান্ডের ফ্রিবার্গ (Fribourg) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য আগমন করেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাসেলে দ্বিতীয় জায়নিস্ট কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার এক ভাই মোসে ওয়াইজম্যান জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি ফ্যাকাল্টির প্রধান ছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে অবস্থিত একটি ইহুদি ইনস্টিটিউটের জন্য অর্থ সংগ্রাহক নিযুক্ত হন। পঞ্চম জায়োনিস্ট কংগ্রেসে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গুরুত্ব তুলে ধরে একটি ডকুমেন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি বেলফোর এবং কনজারভেটিভস্ এমপিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরলে বেলফোর তা সমর্থন করেন। ব্রিটিশ এমপি'রা উগান্ডায় (Brithish Uganda Progrmme) ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জায়নবাদীরা তা প্রত্যাখান করে। ড. ওয়াইজম্যান বেলফোরের (এ সময় বেলফোর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সাথে দেখা করেন এবং সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এর পুরো কৃতিত্ব ছিল ওয়াইজম্যানের। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেরুজালেম সফর করেন। এখানে তিনি স্বপ্নের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তিনি ব্রিটিশ জায়নিস্ট ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি বেলফোর ঘোষণার বাস্তবায়নের জন্য আর্থার বেলফোরের সাথে কাজ করেন। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রিন্স ফয়সাল, আলবার্ট আইনস্টাইনসহ বিশ্বের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করেন এবং সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ড. হাইম ওয়াইজম্যান এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

Scanned by CamScanner

বুদ্ধিজীবীরা প্রচার করে– ইহুদিদের বাস্তব সমস্যার সমাধান কেবল জায়নবাদের দ্বারাই সম্ভব। জায়নবাদ আন্দোলনের প্রথম বছরে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৮,০০০। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এ সংখ্যা দুই লক্ষে পৌঁছায়।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই জেরুজালেমে ৪৫,৩০০ অধিবাসীর মধ্যে ইহুদিদের সংখ্যা ২৮,০০০ ছাড়িয়ে যায়। জায়নবাদ রাশিয়ায় নির্যাতিত ইহুদিদেরও মনে আশার সঞ্চার করে। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে হারৎজেল মৃত্যুবরণ করে। তবে তিনি জায়নবাদকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে একদল অভিবাসী প্রাচীন জাফা বন্দরের কাছে বালিয়াড়ির মধ্যে তেল আবিব এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যৌথ খামার গড়ে তোলে। হারৎজেলের পর ডেভিড গ্রুন (২৪) নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন। বেটেখাটো গ্রুন রাশিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মতো পোশাক পরতেন এবং বেনগুরিয়ান[২৮]

---

[২৮]ডেভিড বেনগুরিয়ান ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর রাশিয়া সাম্রাজ্যের কংগ্রেস পোল্যান্ডের প্লোন্স্ক (Plonsk)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আভিগডোর গ্রুন (Avigdor Grun) জায়নিস্ট গ্রুপের (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রুপের সদস্য ছিল ২০ জন) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৪ বছর বয়সে তিনি এবং তার দুই বন্ধু মিলে গঠন করেন Ezra (Promoting Hebrew Studies and Emigration to the Holy land)। এক বছরের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা ১৫০ জনে উন্নীত হয়। নিরামিষভোজী বেনগুরিয়ান ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জায়নিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক জিউস ওয়ার্কার্স পার্টি (Poalei Zion)-তে যোগ দান করেন। রুশ বিপ্লবের সময় (১৯০৫ খ্রি.) তিনি দুইবার গ্রেফতার হন। আইনজীবী পিতার সহায়তায় তিনি দুই মাস পর মুক্তি লাভ করেন এবং জায়নিস্ট রাজনীতিতে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে তিনি ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে পোল্যান্ড ত্যাগ করেন। তিনি জাফায় অবস্থান নেন এবং ইহুদি কৃষকদের সাথে মিশে যান। তিনি ডে' লেবার হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি দর্জি, কাঠমিস্ত্রি ও জুতার কারিগরদের নিয়ে তিনটি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। এসব সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৫ জন। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ড প্রত্যাবর্তন করেন এবং জার্মানি গমন করেন। পরের বছর বেল জাভির (তার) আমন্ত্রণে জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠিত হিব্রু পত্রিকা হা'দূত (Ha'ahdut)-এ যোগদান করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ভাষা শেখার জন্য থেসালোনিকিতে গমন করেন। ৯ মাস পর তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন আইন বিষয়ে পড়তে। ইতোমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বেনজাভির সাথে তিনি উসমানীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে মিশরে নির্বাসিত হন (মার্চ, ১৯১৫ খ্রি.)। সেখান থেকে তিনি আমেরিকা চলে যান। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গুরিয়ান ব্রিটিশ আর্মিতে যোগদান করেন। Poalei Zion-নেতা বার বরোচভ-এর মৃত্যুর পর সংগঠনটির নাম হয় আহদূত হাআভোডা (Ahdut HaAvoda, the Zionist Lobur Federation in Palestine)। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বেনগুরিয়ান দলটির নেতা নির্বাচিত হন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সংগঠনটির সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইসরায়েল রাষ্ট্রের তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ১৯৩৫ সালে বেনগুরিয়ান জিউজ এজেন্সির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম অবধি সেই দায়িত্ব পালন করেন। We and our Neighbor's (১৯৩১ খ্রি.) এবং My Talks with Arab Leaders (১৯৬৭ খ্রি.) নামে দু'টি গ্রন্থ লেখেন তিনি। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

Scanned by CamScanner

ছদ্মনাম ধারণ করে চলাফেরা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আরব উচ্ছেদ ছাড়াই ফিলিস্তিনে একটি ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কেননা, অতি দরিদ্র এই ফিলিস্তিনিরা সংখ্যায় ছয় লক্ষ হলেও ইহুদিদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো তারা গ্রহণ করবে। যদিও তার কল্পনা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে তরুণ তুর্কিরা জাফায় 'ফিলাস্তিন' নামে একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে। এরা আরব আশা-আকাঙ্ক্ষা; এমনকি আরবি শিক্ষাও শেষ করার পক্ষপাতি ছিল। অপর দিকে আরব জাতীয়তাবদীরা স্বাধীনতার জন্য কৌশল প্রণয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে জায়নবাদীরা ইহুদি নগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় মনোযোগ দেয়। তারা রাষ্ট্রের প্রধান শহর হিসেবে জেরুজালেমে নতুন অভিবাসন উস্কে দেয়। এখানকার বিখ্যাত আব্বাসীয় হোসেইনি ও অপরাপর বনেদী পরিবারগুলো চুপিচুপি জায়নবাদীদের কাছে জমি বিক্রয় করতে থাকে। ফিলাস্তিন পত্রিকার সম্পাদক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে, 'এভাবে চলতে থাকলে জায়নবাদীরা আমাদের দেশের প্রভূত্ব লাভ করবে।'

ইস্তাম্বুল পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার রুহি খালিদি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জমি কেনা নিষিদ্ধ করতে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। উসমানীয় সালতানাতও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে জেরুজালেমে আল-আকসায় জিহাদ ঘোষিত হয়। ফিলিস্তিনে ইহুদিরা উসমানীয় কমান্ডারকে স্বাগত জানায়। জার্মানিরা ব্রিটিশদের নিকট থেকে ইহুদিদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জামাল পাশা জেরুজালেমের প্রশাসক হয়ে আসে। ১৯১৫ সালের ৩০শে মার্চ 'পাশা' ব্রিটিশ গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে দুই আরবকে ফাঁসি দেয়। তারপর ফাঁসি দেয় গাজার মুফতি এবং তার ছেলেকে। বৈরুতে ফাঁসি দেয় আরও ২১ জনকে। এ সময় জাঁকালো তুর্কি টুপি পরিহিত বেনগুরিয়ান জামালের ঘনিষ্ঠ হন এবং ইহুদিদের উসমানীয় বাহিনীতেও জায়গা করতে সহায়তা করেন। তবে পরবর্তীতে জামাল পাশা ইহুদিদের ওপর চড়াও হয়েছিল। বেনগুরিয়ানসহ ৫০০ ইহুদিকে বহিষ্কার করেছিল, বহু জায়নবাদী নেতাকে গ্রেফতার করেছিল। জামাল পাশার বক্তব্য ছিল, আমরা মনে করি জায়নবাদীদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। জামাল পাশার কার্যক্রম নিয়ে জার্মান এবং অস্ট্রিয়ার পত্রিকাগুলো হইচই ফেলে দিয়েছিল। এই সময়টাতে মহামারী, দুর্ভিক্ষ আর বহিষ্কারে প্রায় ২০ হাজার ইহুদি হ্রাস পেয়েছিল। ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোও বাঁচার জন্য ধুঁকছিল কিন্তু জামাল ও তার অনুসারীদের পরিবারগুলো উপচে পড়া আনন্দে বিভোর ছিল এবং তার রুটিন ওয়ার্ক ফাঁসিকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল।

এ সময় জায়নবাদী ইহুদিরা যুদ্ধের গতিশীলতা লক্ষ করে উদ্দেশ্য হাসিলের

Scanned by CamScanner

নীতি গ্রহণ করে। বৃহৎশক্তিবর্গ ও আরব নেতৃবৃন্দ আরব অঞ্চলগুলোতে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে গেলেও ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য ছিল না। তবে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে সাইকস্-পিকো নামে যে গোপন চুক্তি হয়েছিল, তাতে ফিলিস্তিনে একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। এ বছরই ব্রিটিশ কমান্ডার এ্যালেনবি জেরুজালেম দখল করার জন্য আক্রমণ শুরু করে (৩১শে অক্টোবর)। ৭ই নভেম্বর গাজা এবং ১৬ই নভেম্বর জাফা ব্রিটিশদের হস্তগত হয়ে যায়। দামেস্ক থেকে ফিলিস্তিন পরিচালনাকারী জামাল পাশা দামেস্কে দুই ইহুদি গুপ্তচরকে ফাঁসি দেন, তারপর জেরুজালেমের সব ইহুদিকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। বলেন, ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে সেখানে কোনো ইহুদি জীবিত রাখা হবে না। জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণকারী জার্মানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ৭ ডিসেম্বর ব্রিটিশরা জেরুজালেম দখলে নেয়। ওয়াইজম্যান তার জায়নবাদী কমিশন নিয়ে প্রবেশ করেন এখানে। ২০ ডিসেম্বর রোন্যান্ড স্টোরস জেরুজালেমের সামরিক গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরই মধ্যে আমেরিকার সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ঘোষণা করে যে, 'প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য একটি আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা করা হবে।' এই ঘোষণা ছিল জায়নবাদীদের জন্য এক বিরাট বিজয়। এরপর জায়নবাদীদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় অন্যান্য মিত্রশক্তি কর্তৃক বেলফোর ঘোষণার অনুমোদন এবং সাইকস্-পিকো চুক্তিতে ফিলিস্তিনে যে আন্তর্জাতিক প্রশাসন প্রবর্তিত করার কথা ছিল, তার পরিবর্তে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসন প্রবর্তন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইতালি ঘোষণাটি অনুমোদন করে এবং স্যানরেমো সম্মেলনে ব্রিটেনকে প্যালেস্টাইনের ওপর ম্যান্ডেটরি শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এরপর ইহুদিরা ফিলিস্তিনে আগমন করতে থাকে। প্রথম সংঘবদ্ধ আগমন (আলেয়া) মান্ডেটরি শাসনের পূর্বে ঘটলেও বাকি চারটি আলেয়া ব্রিটিশ শাসনামলে ঘটে। পঞ্চম এবং শেষ আলেয়াতেই সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক ইহুদি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে।

ফিলিস্তিনে ইহুদি (আলেয়া) আগমন

আলেয়া	বৎসর	আগত ইহুদি	আলেয়া	বৎসর	আগত ইহুদি
প্রথম	১৮৮২-১৯০৩	৩০,০০০	চতুর্থ	১৯২৪-১৯৩১	৮২,০০০
দ্বিতীয়	১৯০৪-১৯১৪	৪০,০০০	পঞ্চম	১৯৩২-১৯৪৯	৩০০,০০০
তৃতীয়	১৯১৯-১৯২৩	৩৫,০০০			

Scanned by CamScanner

অধ্যায় নয়

অবিমৃশ্যকারী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এবং মুসলিম ভূ-খণ্ডে ইসরায়েলের জন্ম

উসমানীয় সুলতান মহামতি সোলায়মান (১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.) ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসকে চিঠি লিখেছিলেন, 'আমি– যিনি সুলতানদের সুলতান, রাজার রাজা, বিশ্বের বুকে সমস্ত রাজার মুকুটদাতা, পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া, শ্বেতসাগর এবং কৃষ্ণসাগর, রুমেনিয়া, আনাতোলিয়া, কারামানিয়া, রুম ভূ-খণ্ড, জুলকান্দ্রিয়া, দিয়ারবেকির, কুর্দিস্তান, আজারবাইজান, পারস্য, দামাস্কাস, আলেপ্পো, কায়রো, মক্কা, মদীনা, জেরুজালেম, সারা আরব, ইয়ামান এবং অন্যান্য দেশ– যা আমাদের পূর্বপুরুষদের (আল্লাহ তাদের কবরকে আলোকিত করুন) বাহুবলে জয় করা ভূ-খণ্ড এবং আমার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ মহিমাময় আল্লাহর দান করা ভূখণ্ডের সর্বময় কর্তা। আমি সোলায়মান খান, সুলতান সেলিম খানের পুত্র, সুলতান বায়োজিদ খানের পৌত্র; তোমার উদ্দেশ্যে, ফ্রান্সের রাজা।'

এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন মহামতি সোলায়মান খানের মৃত্যুর পরই শুরু হয়। পতনের ইতিহাসটা বেশ দীর্ঘ এবং ভুলে-ভ্রান্তিতে ভরা। এরপর থেকে আক্রমণের পরিবর্তে আত্মরক্ষাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে অন্তর্কলহ ও অবক্ষয়; অন্যদিকে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস। তাদের এই প্রয়াস উসমানীয় সাম্রাজ্যের নাম দেয় ইউরোপের রুগ্ন মানুষ এবং এই ভূ-খণ্ডটিকে গ্রাস করতে বহুমুখী তৎপরতার জোগান দেয়।

ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বের ফলে বৃহৎ শক্তিবর্গ এই এলাকার ওপর স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানি, ফ্রান্স ও রাশিয়া এ এলাকার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলে ব্রিটেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকার প্রত্যেক শেখের সাথে একই ধরনের একক সুবিধামূলক চুক্তি সাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমে শেখগণ এই মর্মে

Scanned by CamScanner

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, ব্রিটিশ সরকার ব্যতীত অন্য কারো সাথে তারা তাদের রাজ্যের কোনো অঞ্চল কোনোভাবেই হস্তান্তর করবে না। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত অন্য কোনো বৈদেশিক শক্তির সাথে কোনো প্রকার সম্পর্কও স্থাপন করতে পারবে না। এভাবে তারা বেশ কিছু অঞ্চলকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দেন। এ সময় রাশিয়াও পারস্যের বেশ কিছু অঞ্চল চুক্তির মাধ্যমে লাভ করে। মধ্যএশিয়ার খোকন্দ, বোখারা, খিভা ও ট্রান্স কাস্পিয়ান অঞ্চল রাশিয়া দখল করে। এই দুই শক্তি সুয়েজ খালেরও ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই ব্রিটেন মিশরকে তার রক্ষিত দেশ বলে ঘোষণা করে। সিরিয়া-লেবাননের ওপর ফ্রান্স এবং ইরাক-ফিলিস্তিন-ট্রান্সজর্ডানের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

জার্মানির পক্ষে উসমানীয় সাম্রাজ্যের যোগদানে (১৯১৪ খ্রি.) মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্য বৃহৎ শক্তিবর্গের বিপরীতমুখী স্বার্থের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সরকার আরব ভূ-খণ্ড আরবদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে তৎপরতা শুরু করে। আরব ভূ-খণ্ডের দাবির পক্ষে কাবা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক শরিফ হুসাইন ইবনে আলীকেই তারা অধিকারযোগ্য বলে মনে করে। এই শরিফ হুসাইনের সঙ্গে উসমানীয়দের সম্পর্ক ভালো ছিল না। আরব ভূ-খণ্ডের বাদশাহ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর শরিফ হুসাইন দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার লর্ড কিচেনারের কাছে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল– উসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্রিটিশ সহযোগিতা পাওয়া। তাই উসমানীয় সাম্রাজ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেও মক্কার শরিফ হুসাইন নীরবতা পালন করেন। এতে স্বভাবতই শরিফ হুসাইন মিত্রশক্তির প্রশংসা লাভ করেন। উপরন্তু ফিলিস্তিনে জামাল পাশার কার্যক্রম শরিফ হুসাইনের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় মক্কার শরিফ হুসাইন মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমেহনের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন। প্রথম পত্রে শরিফ হুসাইন (১৯১৫ খ্রি., ১৪ই জুলাই) আরব জাতির পক্ষ থেকে ব্রিটেনকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পরিবর্তে তিনি উত্তরে মার্সিন আদানা থেকে ৩৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বিরেজিক-উরফা-মারডিন-মিদিয়াত-জাজিরাত ইবন উমর-আমাদিয়া হয়ে পারস্য সীমানা পর্যন্ত, পূর্বে পারস্যের সীমানা থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত দাবি করেন। এখান থেকে এডেনকে বাদ দেওয়া হবে। এই খিলাফতের ওপর ব্রিটিশ সহায়তা কামনা করা হয়। স্যার হেনরি ম্যাকমেহন শরিফ হুসাইনের

Scanned by CamScanner

পত্রের সারাংশ লন্ডনে প্রেরণ করেন এবং প্রস্তাবিত উত্তরের একটি খসড়াও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। এই খসড়া অনুমোদিত হয় এবং সেটাই শরিফ হুসাইনের পত্রের উত্তরস্বরূপ ৩০শে আগস্ট প্রেরণ করা হয়। এই পত্রে ম্যাকমেহন আরব খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের গভীর আগ্রহের কথা ঘোষণা করেন। তবুও শরিফ হুসাইন তৃপ্ত হতে পারেননি। সেজন্য ৯ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় পত্র লেখেন এবং এই পত্রে পুনরায় প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের ওপর জোর দেন। সরকারের অনুমোদনক্রমে দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে (২৪শে অক্টোবর) ম্যাকমেহন আরব রাষ্ট্রের সীমানা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করে এই এলাকার ওপর মিত্রশক্তির, বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। দ্বিতীয় পত্রে ম্যাকমেহন দামেস্ক, হিমস্, হামা, আলেপ্পোকে আরব ভূখণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করতে অস্বীকৃতি জানান। আবার বাগদাদ ও বসরাতে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু রাখার কথা বলেন। দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে হুসাইন দামেস্ক, হিমস্, হামা, আলেপ্পোতে আরব চরিত্র সম্বন্ধে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। এসব পত্রাবলি যখন চালাচালি হচ্ছিল, তখন ফরাসি সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি জর্জ পিকোর সাথে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্যার মার্ক সাইকস্-এর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল– প্যালেস্টাইনে একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। এই ব্যবস্থার চূড়ান্তরূপ রাশিয়ায় সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য মিত্রশক্তি ও আরব বা আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে চুক্তির পর স্থির করা হবে। মানচিত্রে এই এলাকাটিকে বাদামি রঙে চিহ্নিত করা হয় বলে এটি পিঙ্গল এলাকা বা Brown Zone নামে পরিচিত হয়। হাইকা ও আকর বন্দরদ্বয়ের কর্তৃত্ব ব্রিটেনের ওপর ন্যস্ত হয়।

বেলফোর ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই আরব নেতৃবৃন্দের মনে ব্রিটেনের নীতি সম্বন্ধে সংশয়ের সৃষ্টি করে। ফলে এই সংশয় দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কায়রোর ব্রিটিশ আরব সংস্থার প্রধান ডেভিড জর্জ হোগার্থকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাদশাহ হুসাইনের কাছে প্রেরণ করে। তিনি বাদশাহকে বলেন, আরবদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বসতি স্থাপন করা হবে। শরিফ হুসাইন মন্তব্য করেন যে, আরবদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রেক্ষিতেই কেবল ইহুদিদের আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। এ সময় বৈরুত ও দামেস্কে বেশকিছু বিখ্যাত আরব ব্যক্তিকে জামাল পাশা ফাঁসি দিলে দামেস্কে অবস্থানরত শরিফ হুসাইনের সন্তান ফয়সাল দামেস্ক ত্যাগ করে হেজাজে চলে আসেন। এখানে তিনি তার বড় ভাই আলীর সাথে আলোচনায় বসেন

Scanned by CamScanner

এবং অতি দ্রুত বিদ্রোহ শুরুর কথা ঘোষণা করতে শরিফ হুসাইনকে জানান। বিদ্রোহী আরবগণ শরিফ হুসাইনের জ্যেষ্ঠপুত্র আলী, দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ এবং তৃতীয় পুত্র ফয়সালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে বসে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এ্যালেনবি সিনাই উপদ্বীপ অতিক্রম করে জেরুজালেম শহর দখল করেন। এর পূর্বেই এ্যালেনবির বাহিনীর সাথে ফয়সালের বাহিনী মিলিত হয়। প্যালেস্টাইনসহ সমগ্র দক্ষিণ সিরিয়া মিত্রবাহিনীর দখলে আসে।

আরবরা বেলফোর ঘোষণায় ভীত হলেও জেরুজালেম দুই বছর শান্ত ছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ওয়াইজম্যান ফয়সালের সাথে দেখা করেন। ফয়সাল একমত হন যে, আরব কৃষকদের অধিকার লঙ্ঘন না করেই ফিলিস্তিন ৪০ থেকে ৫০ লাখ ইহুদি গ্রহণ করতে পারবে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুলাই জেনারেল এ্যালেনবি জেরুজালেমের মুফতি, অ্যাংলিকান বিশপ, দুই প্রধান রাব্বি ও ওয়াইজম্যানকে নিয়ে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ ফয়সাল নিজেকে সিরিয়ার (লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ) বাদশাহ ঘোষণা করেন। এ সময় জেরুজালেমে এক দাঙ্গা বাঁধে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে। এতে পাঁচ ইহুদি ও ৩৪ জন আরব নিহত হয়। এই সময়টাতেও ওয়াইজম্যান এবং বেনগুরিয়ান আশাবাদী ছিলেন– ধীরে ধীরে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং আরবদের সঙ্গে বিবাদও মেটানো সম্ভব হবে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল স্যানরেমো সম্মেলনে বেলফোর ঘোষণার ভিত্তিতে ফিলিস্তিন শাসন করার ম্যান্ডেট গৃহীত হয়। স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েলকে প্রথম হাইকমিশনার নিয়োগ করা হয়। প্রায় ৯০,০০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে (এদিকে সৌদি গোত্রপতি ইবনে সৌদের কাছে হেরে গেছেন শরিফ হুসাইন। ফয়সাল বাদশাহ হন ইরাকের আর আব্দুল্লাহ পায় ট্রান্সজর্ডান)। কেবল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেই ইহুদিরা বনেদি মুসলমান পরিবারগুলোর নিকট থেকে ৪৪ হাজার একর জমি ক্রয় করে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান হিটলার। এতে ইউরোপীয় ইহুদিরা আতঙ্কিত হয়। ১৯৩৩ সালে ফিলিস্তিনে আসে ৩৭ হাজার ইহুদি; ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ৪৫ হাজার, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আসে ১ লাখ ইহুদি। আর খ্রিস্টান ও আরব মুসলমান ছিল ৬০,০০০। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে আরব জনসংখ্যা ছিল চার লাখ ১৯ হাজার আর ইহুদি ছিল তিন লাখ ৪৩ হাজার। এ সময় ওয়াইজম্যান বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং বেনগুরিয়ান ইহুদিদের মধ্যে ক্ষমতাধর

Scanned by CamScanner

আবির্ভূত হয়। তবে দুজনই ছিল জায়নবাদীর নেতৃত্বে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জায়নবাদী নেতৃবৃন্দ মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নিউইয়র্কে আমেরিকার জায়নবাদীদের সম্মেলনে এই মনোভাব প্রকাশ পায়। জায়নবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল শ্রমিকদল ব্রিটেনে এবং হ্যারি ট্রুম্যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে ইহুদিরা তাদের লক্ষ্যপানে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জায়নবাদী সম্মেলনে সমগ্র ফিলিস্তিনে ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প সংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে ফিলিস্তিন সমস্যা আলোচিত হয় এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ফিলিস্তিন পরিদর্শন শেষে ৩১শে আগস্ট রিপোর্ট পেশ করে। কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, গুয়েতেমালা, হল্যান্ড, পেরু, সুইডেন ও উরুগুয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ফিলিস্তিনকে একটি আরব ও একটি ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে ভারত, ইরান ও যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ আরব ও ইহুদি এলাকার স্বায়ত্তশাসনসহ একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। প্রস্তাব দুটি সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটিতে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর সাধারণ পরিষদে বিভক্ত প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ দেশের সমর্থন লাভ করে। ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষ ১৪ই মে ম্যান্ডেটের সমাপ্তি ঘোষণা করে ফিলিস্তিন ত্যাগ করে। জায়নবাদীরা এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের একটা ছায়া সরকার থাকত সবসময়। অতি সহজেই সেই সরকার ঐ দিনই ইসরায়েল নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণা করে। ডেভিড বেনগুরিয়ান এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং ডক্টর ওয়াইজম্যান প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অল্প সময়ের (মাত্র ১১ মিনিটের মাথায়) মধ্যে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদানকারী মুসলিম দেশসমূহ

মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তুরস্ক সর্বপ্রথম ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বেশকিছু চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক ইসরায়েলের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সাথে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। যার মাধ্যমে তুরস্কের মাটিতে ইসরায়েল-তুরস্ক যৌথভাবে সামরিক প্রশিক্ষণসহ তুরস্কের প্রতিরক্ষা প্রশ্নে ইসরায়েলের সহযোগিতায় বেশকিছু বিষয়ে দুই দেশ

Scanned by CamScanner

নতুন করে কাজ শুরু করে। এরপর ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তবে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় মিশরের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জর্ডানও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে দেশটির সাথে। আরবলীগের সদস্য ওমান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দিলেও উভয় দেশের মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক। কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এবং আজারবাইজানের রয়েছে ইসরায়েলের সাথে সুসম্পর্ক। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মার্কিন চাপে ইসরায়েলের সাথে বৈরী সম্পর্ক হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাথে রয়েছে বাহরাইনও। আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন মধ্যস্থতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন ইসরায়েলে দূতাবাস স্থাপন করবে। ইসরায়েলও এই দুটি দেশে তাদের দূতাবাস খুলবে। এসব দেশের মধ্যে বিমান চলাচলও শুরু হবে। এই চুক্তির পর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আরব দেশগুলোর অর্থনৈতিক বয়কট এবং নিষেধাজ্ঞার পরিসমাপ্তি ঘটবে। পারস্পরিকভাবে দেশগুলোর সরকারি-বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যেও অবাধ সহযোগিতা শুরু হবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য একটি কমিশন গঠন করা হবে এবং ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করা হবে। সুদান, সৌদি আরব, ওমানসহ আরো ১০/১২টি মুসলিম দেশ হয়তো ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বভাবিক করতে যাচ্ছে। জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহর সাথে সম্প্রতি (জুলাই, ২০২১ খ্রি.) গোপন বৈঠক করেছেন ইসরায়েলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট। মূলত পুরোনো সম্পর্ক নতুন করে ঝালিয়ে নিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইসরায়েলে দূতাবাস চালু করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (জুলাই, ২০২১ খ্রি.)। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হার্জগ। জুলাই, ২০২১ এর শেষের দিকে আমিরাতে দূতাবাস স্থাপন করে ইসরায়েল। ওই সময় দুবাইতে দূতাবাসটি উদ্বোধন করেন ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াইর লাপিদ। উল্লেখ্য যে, ইসরায়েলি এই নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম সফর এটি। ইসরায়েলকে সংযুক্ত আরব আমিরাত এক কোটি ২০ লক্ষ ডলার দিচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী (জুন, ২০২১ খ্রি.) বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আমিরাতের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এ অর্থ ইসরায়েলে বিনিয়োগ করছেন বলে জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী। করোনা মোকাবেলায়

Scanned by CamScanner

ইসরায়েলের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে এ অর্থ দিচ্ছেন অবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স। অপরদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সহায়তা বিপুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। ২০১৮ এবং ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবছর জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সহায়তা সংস্থায় আমিরাত ৫ কোটি ১৮ লাখ ডলার অনুদান দিলেও ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১০ লাখ ডলার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নিচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। গ্রিসে অনুষ্ঠিতব্য ওই মহড়ায় যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশও অংশ নেবে। প্রথম আরবদেশ হিসেবে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সঙ্গে ভিসামুক্ত ভ্রমণচুক্তি করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

Scanned by CamScanner

দেশটিকে বিভক্ত করার কর্তৃত্ব জাতিসংঘের আছে বলে মনে করেনি আরবরা। ১২ লাখ ফিলিস্তিনি যেখানে দেশটির ৯৪% জমির মালিক, সেখানে ইহুদিদের সংখ্যা ছয় লাখ। আরব নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তিনের বিভক্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। লন্ডন সফররত আরবলীগের সেক্রেটারি জেনারেল আবদুর রহমান আযম এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন, আরবরা ফিলিস্তিনের বিভক্তি সহ্য করবে না। তারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করবে।

এরপর ফিলিস্তিনে স্বাভাবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আরবরা তিনদিনের ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রতিবেশী দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে এবং খণ্ডখণ্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে। সংঘর্ষ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ফিলিস্তিন থেকে ৪ লক্ষ ফিলিস্তিনি বিতাড়িত হয়ে পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলোতে উপস্থিত হয়ে এক বিরাট মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করে। এ রাষ্ট্রের ঘোষণার দিনই মিশর সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকের সৈন্যদল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। প্রায় এক সপ্তাহ জুড়ে যুদ্ধ চলার পর ২২শে মে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র বিরতির আহ্বান জানায়। তবুও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং ১১ই জুন থেকে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চলতে থাকে। মাত্র ছয় সপ্তাহে ১০৬০ জন আরব, ৭৬৯ জন ইহুদি এবং ১২৩ জন ব্রিটিশ নিহত হয়।

আরবলীগের রাষ্ট্রগুলো (মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন) ইসরায়েলে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আরবলীগের সদস্যরা মনে করত– ইহুদিদের হারাতে তেমন সমস্যা হবে না। মিশরীয় বাহিনীর অর্ধেক ছিল মুসলিম ব্রাদার হুডের মুজাহিদিন। যার মধ্যে তরুণ ইয়াসির আরাফাতও ছিল। কাগজে-কলমে আরব বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৬৪ হাজার। তবে

Scanned by CamScanner

সেগুলো যথার্থ প্রশিক্ষিত ছিল না। আব্দুল্লাহকে আরবলীগ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। ইসরায়েল আমেরিকা এবং চেকোস্লোভাকিয়া থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং কয়েকটি বিমান কিনতে সমর্থ হয়। ইসরেয়েলি সৈন্যরা প্রতিটি রণাঙ্গনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা রামাল্লা, নেগেভ মরুভূমিসহ বহু আরব অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে এবং মিশরীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন সবগুলো অবস্থানই দখল করে নেয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে এবং ৩রা এপ্রিল ট্রান্সজর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। এভাবে একে-একে পাঁচটি আরব দেশের সবার সঙ্গে ইসরায়েল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধেই অস্ত্রবিরতি স্বাক্ষর করে। ইসরায়েল অধিকৃত অঞ্চলগুলো প্রত্যার্পণের দাবি করলে ইসরায়েল এ দাবির প্রতি কোনো কর্ণপাতই করেনি। এসব ভূ-খণ্ড থেকে উচ্ছেদকৃত ফিলিস্তিনিদের ক্ষতিপূরণে কেউ এগিয়ে আসেনি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে এ বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৮ বার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মিশর নিয়ন্ত্রিত গাজা এলাকা আক্রমণ করে খান ইউনিস শহরে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বেনগুরিয়ান প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলে লেভি এশকল (৬৮) তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এ সময় মিশরীয় প্রসিডেন্ট নাসের ইসরায়েলকে উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং ৫ লাখ সৈন্য, ৫ হাজার ট্যাংক ও ৯০০ যুদ্ধবিমান নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইসরায়েল ২ লাখ ৭৫ হাজার সৈন্য, ১১শ ট্যাংক ও ২০০ বিমান মোতায়েন করে। মিশর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল– গাজা এবং সিনাই উপত্যকা থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের তারা হটিয়ে দেবে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলি বিমানসমূহ অতর্কিত হামলা করে মিশর ও সিরিয়ার বিশাল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেয়। ইসরায়েলি বিমানবাহিনী মিশরের বিমানবাহিনীর ওপর হামলা শুরু করলে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়। জর্ডান ও সিরিয়া মিশরের পক্ষে নামলে যুদ্ধ দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। ৫ই জুন সকালে ইসরায়েলি বিমান ও স্থলবাহিনী আক্রমণ করে মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে মিশরীয়, সিরীয় ও জর্ডানীয় বিমানবাহিনী ধ্বংস করে ফেলে। মাত্র ছয় দিনে ইসরায়েলি সৈন্যরা সুয়েজ খাল, জর্ডান নদীর পূর্বতীর এবং সিরিয়ার উচ্চভূমি দখল করে নেয়। নয়জন মিশরীয় জেনারেল, তিনশ'র বেশি অফিসার, হাজার হাজার যুদ্ধবন্দি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রুশ নির্মিত সামরিক সরঞ্জামাদি ইসরায়েলের হস্তগত হয়।

Scanned by CamScanner

মিশরের নিকট থেকে গাজা এলাকা ও সিনাই উপদ্বীপ, সিরিয়ার নিকট থেকে গোলান উচ্চভূমি এবং জর্ডানের নিকট থেকে জর্ডান নদীর সমগ্র পশ্চিমতীরও দখল করে। এরপর থেকে জেরুজালেমও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ইসরায়েল সমগ্র জেরুজালেম, জর্ডান নদীর সীমান্ত বরাবর এলাকা, গোলান মালভূমি, সিনাই উপত্যকাসহ বেশকিছু কৌশলগত এলাকা দখল করলে ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী আরব রাষ্ট্রগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এর ফলে ইসরায়েলের আয়তন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ইসরায়েল নিশ্চিহ্নের পরিবর্তে স্থায়ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্বীয় পরাজয়ের গ্লানিতে নাসের পদত্যাগ করে।

তবে সফলতা বলতে যেটুকু, তা হচ্ছে– মাঝে মাঝে হিজবুল্লাহ গেরিলা বাহিনীর সফলতা। হিজবুল্লাহ সৈন্যরা ইসরায়েলের আক্রমণের জন্য অপেক্ষায় থাকে। কেননা, এর ফলেই তারা ওপাশ আক্রমণের সুযোগ পায়। ২২শে জুলাই, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের হিজবুল্লাহ মিলিশিয়াদের হাতে দুই ইসরায়েলি সৈন্য আটকের ঘটনায় ইসরায়েলি বিমানবাহিনী লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে স্থল ও বিমান হামলা চালায়। হামলায় দুজন নাগরিক নিহত হয়। পরবর্তীতে হামলায় (১২ দিন ধরে) ৩৬০ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। সমগ্র লেবানন জুড়ে চলে ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতা। লাখ লাখ মানুষ লেবানন ছেড়ে চলে যায়। প্রায় ১৮০০ লক্ষ্যবস্তুতে ইসরায়েল আঘাত হানে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহ গেরিলারা জবাব দেয়। হিজবুল্লাহ কখনোই ইসরায়েলি আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত হয় না; বরং নতুন উদ্যমে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে রকেট ও মর্টার হামলা চালানো অব্যাহত রাখে। তারা ইসরায়েলের হাইফাতেও মাঝারি দূরত্বের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। অনেকের ধারণা– এরপর হিজবুল্লাহ তেল আবিবে হামলা চালাবে।

আল কুদস্ দিবস

সেই ঘটনার স্মরণে (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল কর্তৃক জেরুজালেম দখল) প্রত্যেক রমজান মাসের শেষ শুক্রবার পালিত হয় আন্তর্জাতিক আল কুদস দিবস। ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে একাত্মতা ও জায়নবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কল্পে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই দিবস পালন করা হয়। ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হওয়ার পর ইমাম খোমেনী এ দিবস পালনের আহ্বান জানান।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় এগারো

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিএলও-ফাতাহ্

ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আরবলীগ বরাবরই সক্রিয় ছিল। আরবলীগের উদ্দেশ্য ছিল আফ্রো-এশিয়া দেশগুলোর সহায়তায় ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামকে সফলতার দিকে পরিচালিত করা এবং ইসরায়েলের আগ্রাসী নীতিকে প্রতিহত করা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার পর আরবলীগের উদ্যোগেই আহমেদ হিলমির নেতৃত্বে নিখিল ফিলিস্তিন সরকার গঠিত হয়। তবে এ সরকার তেমন কোনো কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেনি। পরে আরবলীগের উদ্যোগে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কায়রো সম্মেলনে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (Palestine Liberation Organization) গঠিত হয়। PLO গঠনের পর থেকে ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলন একটি কাঠামোবদ্ধ পথে অগ্রসর হয়। আসলে সংস্থাটি গঠন করা হয় বৈধভাবে সমর্থন জানানোর উদ্দেশ্যে। আহমাদ শুকাইরি (Ahmad Shukairi) এর নেতা নির্বাচিত হন। ইতঃপূর্বে ইহুদি প্রতিরোধ আন্দোলন বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত হতো। যেমন– ইহুদিরা জেরুজালেমে আরব মালিকানাধীন (১৯৪৮ খ্রি., জানুয়ারি) সেমিরাসিম হোটেল বোমা মেরে উড়িয়ে দিল। প্রতিরোধ স্বরূপ আরবগণ ইহুদি মালিকানাধীন পোস্ট ভবন ধ্বংস করে প্রতিশোধ নিল। এবার ইহুদিরা (২৯শে এপ্রিল) দিয়ার ইয়াসির গ্রাম অবরুদ্ধ করে ২৫৪ জন পুরুষ, মহিলা ও ছেলে-মেয়ে হত্যা করল (ইরগুন-স্ট্রার্ন দল)। এর কয়েকদিন পর আরবরা একটি গাড়ি আটক করে ৮০ জন ডাক্তার, নার্স এবং ছাত্রকে হত্যা করল। তবে ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার পর ইহুদিরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ফিলিস্তিনিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও মাইক ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কোনো কোনো গ্রামে ইসরায়েলি সৈন্যরা আরবদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়।

Scanned by CamScanner

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসির আরাফাত ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে (কায়রোতে অনুষ্ঠিত পিএলও-এর পঞ্চম কাউন্সিলে এই পদ লাভ করেন) পিএলও যথার্থভাবে ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪/২৪শে আগস্ট কায়রোতে জন্মগ্রহণকারী ইয়াসির আরাফাতের পূর্ণ নাম মুহাম্মদ আবদেল রহমান আবদেল রউফ আরাফাত আল কুদুয়া আল হুসাইনী। আবু আম্মার নামেও তিনি খ্যাত। তিনি ফাতাহ্ নামক রাজনৈতিক দলেরও প্রতিষ্ঠাতা। এই দলটিকে তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করলেও তার বাবা একজন ফিলিস্তিনি এবং মা মিশরীয়। তিনি কিং ফুয়াদ ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর যে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জেনারেল ইউনিয়ন অফ প্যালেস্টিনিয়ান স্টুডেন্টস-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ইয়াহিয়া হালুদার আহ্বানে ইয়াসির আরাফাত ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তার বন্ধুদের নিয়ে গঠন করেন ফাতাহ্ নামক সংগঠন। এর আরবি অর্থ পান– তাহরির আল-ওয়াতানি আল-ফিলাসতিনি (The Plestinian National Liberation Movement)। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিএলও-তে যোগদান করেন। এসময় আহমাদ শুকাইরি দায়িত্ব ছেড়ে দেন এবং ইয়াহিয়া হামুদা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে এর চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর আরব জাহানের সর্বত্র হতাশা নেমে আসে এবং ফিলিস্তিনি যুবকদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব জন্ম নেয়। জর্ডানে বসবাসরত ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের মধ্যে স্বাধীনতাকামী আন্দোলন জোরদার হয়; ফলে আল-ফাতাহ্ (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসির আরাফাত তার ২০ জন সঙ্গীকে নিয়ে ফাতাহ্ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন) এবং Popular Front For the Liberation of Palestine (PFLP) (মার্কস্‌বাদী) সামনে এগিয়ে আসে। এছাড়া মার্কস্‌বাদী নাইফ হাওয়াতমের নেতৃত্বে Popular Democretic Front (PDF)ও কাজ শুরু করে। আল-ফাতাহ্ এর সদস্যবৃন্দ সিরিয়া ও আলজেরিয়াতে প্রশিক্ষণ নেয়; পক্ষান্তরে PFLP দলের অনেকেই ভিয়েতনাম, গণচীন ও উত্তর কোরিয়াতে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অনবরত আঘাত হেনে সব সময় রাষ্ট্রটিকে ব্যতিব্যস্ত রাখার নীতি গ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

জর্ডানে ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা বেশ জোরদার হয়ে ওঠে । জর্ডান নদীর পূর্ব-তীরকে তারা ইসরায়েলে গেরিলা আক্রমণের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন। এতে জর্ডান-ইসরায়েল সম্পর্কের অবনতি ঘটে আবার জর্ডানি পুলিশ-সেনাবাহিনীর সাথেও রুশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ফিলিস্তিনি কমান্ডারদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে পড়ে। এসময় ফিলিস্তিনি গেরিলারা একটা বিমান ছিনতাই করলে কমান্ডারদের ক্ষমতা সীমিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জর্ডানি বাহিনী ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরে আক্রমণ করে। এই অসম সংঘর্ষে বহু ফিলিস্তিনি নিহত হয় এবং শিবিরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরপর ফিলিস্তিনি মুক্তিবাহিনীর জর্ডানি শক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। ইয়াসির আরাফাত তার ২০০০ সঙ্গী নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে সিরিয়া থেকে ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের নেতাকর্মীরা লেবাননে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এখান থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গেরিলা তৎপরতা শুরু করেন।

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে স্পর্শকাতর ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত লেবাননে প্রায় তিন লক্ষ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু এসে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানগণ এই ফিলিস্তিনিদের মেনে নিতে পারলেও খ্রিস্টানগণ বাস্তুহারাদের অবাঞ্চিত অতিথিই মনে করত। উপরন্তু এই ফিলিস্তিনিরা এখান থেকেই পরিচালনা করে গেরিলা যুদ্ধ। ফলে এখানকার পরিস্থিতিও জটিল হয়ে ওঠে এবং এই দেশও ইসরায়েল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। গেরিলা তৎপরতার প্রত্যুত্তরে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননের ওপর হামলা করতে থাকে। এ সময় আরাফাতের দল মিউনিখ অলিম্পিক গেমস-এ গেরিলা আক্রমণ করে ১১ ইসরায়েলি ক্রীড়াবিদকে হত্যা করে। তবুও এই সংস্থাটি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয় ফিলিস্তিনি সমস্যার কারণে। এ ঘটনার প্রায় ২ বছর পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তৃতা করার সুযোগ পান।

লেবানন থেকে গেরিলা তৎপরতা বন্ধের জন্য খ্রিস্টান দলগুলোও দাবি তোলে। এতে মুসলমান-খ্রিস্টান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দক্ষিণপন্থী খ্রিস্টান দলগুলো, বিশেষ করে কাতায়িব দল লেবানন থেকে ফিলিস্তিনি গেরিলাদের উৎখাত করার জন্য গোপনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অপর দিকে মুসলিম দলগুলোও ফিলিস্তিনিদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। প্রথমদিকে মুসলিম দলগুলো ভালো করলেও পরবর্তীতে ফিলিস্তিনি শিবিরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রায় দেড় বছর (১৯৭৫-১৯৭৬ খ্রি.) ধরে

Scanned by CamScanner

সংঘটিত এই গৃহযুদ্ধে ফিলিস্তিনি গেরিলা দল এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। তবুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনি গেরিলারা এ অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করত। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২৫,০০০ সৈন্য নিয়ে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে হানা দেয়। অতর্কিত হামলায় ফিলিস্তিনিরা দিশেহারা হয়ে পড়লেও পিএলও বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ইসরায়েলকেও বেশ মাশুল দিতে হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইসরায়েল আবারও লেবাননে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা করে বসে এবং লেবাননের ওপর একটি চুক্তি চাপিয়ে দেয়।

ইয়াসির আরাফাত পিএলও এবং ফাতাহ্‌র কার্যালয় তিউনিসিয়ায় স্থানান্তর করেন। তবুও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন অভিযোগ করেন যে, এখনও ২০০০ পিএলও যোদ্ধা বৈরুতে আছে। চুক্তি ছিল পিএলও যোদ্ধারা বৈরুত ত্যাগ করবে কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যরা থাকবে এবং ইহুদি বাহিনী তাদের নিরাপত্তা দেবে। কিন্তু তার পরিবর্তে ৮০,০০০ ফিলিস্তিনি পরিবারকে শাতিলাও সাবরা নামক শিবিরে অবরুদ্ধ করে খ্রিস্টান মিলিশিয়াদের নিকট হস্তান্তর করে। রাতের আঁধারে খ্রিস্টানরা হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ খ্রি.) । ১৯৮২ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিউনিসিয়া থেকে পিএলও-ফাতাহ্‌ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে ইসরায়েলি আক্রমণের মুখে গেরিলারা এই স্থান ত্যাগ করলেও এক বছর পর ফিরতে শুরু করে। এ সময় লেবাননে অবস্থানরত মার্কিন ও ফরাসি বাসস্থলে এক বিস্ফোরণে ২০০ মার্কিন ও ফরাসি সৈন্য নিহত হয় ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পিএলও বলে, 'ভাল্লুকের আস্তানায় ঢুকলে কিছু আঁচড় খেতেই হবে।'

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিফাদা বা গণবিক্ষোভ শুরু হলে পিএলও-ফাতাহ্‌ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইন্তিফাদা পিএলও ও ইয়াসির আরাফাতকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি এবং তাকে জাতিসংঘে বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দেয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে একটি আরব প্রস্তাবে পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর থেকে পিএলও ফিলিস্তিনিদের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পূর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করেন, 'আরব-ইসরায়েল সংঘাতে

Scanned by CamScanner

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ, প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর মধ্যে পিএলও এমন একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসা খুঁজে বের করবে, যাতে সবাই শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করার অধিকার ও নিশ্চয়তা লাভ করে।' এরপর যুক্তরাষ্ট্র পিএলও-র সাথে সরাসরি আলোচনার আয়োজন করে। ইউরোপীয় দেশসমূহ ও আরব রাষ্ট্রসমূহ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। মার্কিন প্রতিনিধি হিসেবে তিউনিসিয়াস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে চারজন পিএলও প্রতিনিধির সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয় এবং পিএলওকে ফিলিস্তিনিদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নেয়। শান্তি আলোচনা অগ্রগতি লাভ করে এবং পিএলও ও ইসরায়েল সমগ্র বিশ্বকে তাক লাগিয়ে এক বিস্ময়কর শান্তিচুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। অর্ধ-শতাব্দীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভুলে ইসরায়েল-পিএলও পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটনে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অসলো চুক্তি নামে পরিচিত। এই দুইপক্ষের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বেলজিয়ামের রাজধানী অসলোতে। ২৭শে আগস্ট চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ এটাকে সমর্থন করে। অসলো শান্তি চুক্তির পর ইসরায়েল পিএলওকে ফিলিস্তিনি জনগণের আইনানুগ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রতিবক্তব্যে ইয়াসির আরাফাত বলেন, 'ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য সন্ত্রাস, হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং এর উচ্ছেদের আগ্রহকে বিদায় জানাই।' ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শিমন প্যারেজ ও আইজ্যাক রবিনের সাথে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

চুক্তি সম্পাদনের পর চরমপন্থী ইহুদির গুলিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন নিহত হন। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন শ্রমিক দলের মিশন প্যারেজ। তিনি চুক্তির উক্ত বিষয় দু'টি মানার চেষ্টা করেন। ফলে পশ্চিম-তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং এখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারও হচ্ছিল, তবে ধীর গতিতে। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনে মিশন প্যারেজ পরাজিত হয় এবং বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এরপর থেকে পশ্চিম-তীরে আবারো জোরেসোরে ইহুদি বসতি নির্মাণ শুরু হয়। নেতানিয়াহুর সাফ জবাব, পশ্চিম-তীরে স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনের প্রশ্নই আসে না। বড়জোর সেখানে ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যেতে পারে। শর্ত হচ্ছে– পিএলও, হামাস প্রমুখ চরমপন্থী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। ১৩ই অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই স্বায়ত্তশাসন চুক্তি কার্যকর হয়। তবে চুক্তির মৌল বিষয়গুলো মেনে নিতে

Scanned by CamScanner

পরবর্তীতে ইসরায়েল অস্বীকৃতি জানায় এবং টালবাহানা অব্যাহত রাখলে আরাফাত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'পুনরায় ইন্তিফাদা আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।' তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি হন।

ফিলিস্তিনি আইন পরিষদে প্রেসিডেন্ট আরাফাত স্বীকার করেন যে, স্বশাসিত সরকার অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এবং শান্তি প্রক্রিয়ার মৃত্যু হতে চলেছে।' ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম-তীর থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানান এবং সমগ্র জেরুজালেম নিয়ে বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত এবং জর্ডানের বাদশাহ হোসেন অন্তর্বর্তীকালীন ফিলিস্তিনি শান্তি চুক্তিতে (২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৮ খ্রি.) স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল পশ্চিম-তীরের ১৩ শতাংশ ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। অপরদিকে আরাফাত পিএলও সনদ থেকে ইসরায়েল-বিরোধী ধারাটি বাদ দিতে ভোট গ্রহণের জন্য ফিলিস্তিনি জাতীয় পরিষদে সম্মেলন ডাকেন।

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় মার্কিন ইহুদি সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের প্রতি শান্তি প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সমর্থন দানের আহ্বান জানান। অপরদিকে পিএলও'র নির্বাহী কমিটি নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য পিএলও'র সশস্ত্র গ্রুপ 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন'-এর সাথে প্রথম মিলিত হয়। গ্রুপটি ইসরায়েলের সাথে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে আসছিল। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ইসরায়েলি নির্বাচনে ইহুদ বারাক নির্বাচিত হন এবং তিনি শান্তির পথে অগ্রসর হন। তিনি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সাথে দ্বি-পক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হয়ে শান্তি আলোচনাকে সঠিকপথে এগিয়ে নেওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তবে ইসরায়েল এই চুক্তিও পালন করেনি। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ইসরায়েলি নির্বাচনে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পরাজিত হয় এবং লেবার পার্টির ইহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এরপরই ইসরায়েল লেবাননের হিজবুল্লাহ গেরিলাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে শান্তি আলোচনা স্থবির হয়ে পড়ে। ফিলিস্তিন জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি রাষ্ট্র চায়; ইসরায়েল চায় জেরুজালেম

Scanned by CamScanner

তাদের রাজধানী হোক এবং ফিলিস্তিনিরা গাজা, পশ্চিমতীরের জেরিকো এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ে থাক। এ সময় (৮ই ডিসেম্বর, ২০০০ খ্রি.) হামাস আত্মঘাতি হামলা চালালে ২৭ জন ইহুদি নিহত হয়। ফলে ইসরায়েল আমেরিকার অনুমতি নিয়ে গাজা শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

২০০১ খ্রিস্টাব্দের ইসরায়েলি নির্বাচনে কট্টরপন্থী এরিয়েল শ্যারন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হন। এই সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জর্জ বুশ। শ্যারন এবং জর্জ বুশ ফিলিস্তিনিদের কোনোরূপ ছাড় দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। এ সময় ইসরায়েল, পশ্চিম-তীর ও গাজার ইহুদি বসতিতে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটে এবং অবিরাম মর্টার হামলা চলতে থাকে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ইয়াসির আরাফাতকে তার পশ্চিম-তীরের অফিসে আবদ্ধ করে রাখে। হাজার হাজার ফাতাহ্ সমর্থক এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র ইয়াসির আরাফাতের পরিবর্তে তার ডেপুটি মার্কিনঘেঁষা মাহমুদ আব্বাসের সাথে আলোচনা করতে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে চাপ প্রয়োগ করে। চাপের মুখে ইয়াসির আরাফাত মাহ্মুদ আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন (২০০৩ খ্রি.)। প্রধানমন্ত্রী শ্যারন প্রেসিডেন্ট আরাফাতের সাথে কোনোরূপ আলোচনার পক্ষপাতি ছিল না। শ্যারন আরাফাতকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করে, তার সদর দফতর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়, তার হেলিকপ্টারগুলো ধ্বংস করে, তাকে ট্যাংক দ্বারা অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তাকে হত্যা বা নির্বাসিত করার ঘোষণা দেয়। এসময় মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলে (২০০৩ খ্রি.) ইয়াসির আরাফাত আহমেদ কোরেইকে প্রধামন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

শ্যারনের দখলদার বাহিনী হামাসের অধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে (২৬শে মার্চ, ২০০৪ খ্রি.) ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে। ফলে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি রাস্তায় নেমে আসে এবং ১০ জন ইহুদিকে হত্যা করে। শ্যারন একতরফাভাবে গাজা থেকে ইহুদি সৈন্য ও বসতি স্থাপনকারীদের সরিয়ে নেয়। এদিকে পশ্চিম-তীরের রামাল্লায় পিএলও-র সদর দফতরে বন্দি জীবন কাটাতে কাটাতে ইয়াসির আরাফাত অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ২৮শে নভেম্বর, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ৭৫ বছর বয়সে ইয়াসির আরাফাত ইন্তেকাল করেন। ইয়াসির আরাফাত তার ক্ষমতার বলয়

Scanned by CamScanner

দু'ভাগে ভাগ করে উভয়ের শীর্ষ নেতা ছিলেন। একটি হলো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (Palestine Authority) এবং অপরটি হলো পিএলও। এ সময় হামাস গাজায় নিজেদের গণসমর্থিত জনপ্রিয় দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় বারো

প্রতিরোধ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম : মুক্তিকামী হামাস

সাইয়্যেদ বান্না[২৯] শহীদ (রহ)-এর সংগঠন আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন মিশরের ইসমাইলিয়াতে কার্যক্রম (১১ই এপ্রিল, ১৯২৯ খ্রি.) শুরু করেছিল। এই সময়টাতে আরব ভূ-ভাগে আধিপত্যবাদী শক্তির কর্তৃত্ব ছিল। শায়খ বান্না (রহ)-এর লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশ থেকে এ অঞ্চল মুক্ত করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করে শরীয়াহ বাস্তবায়ন। শীঘ্রই বান্না (রহ)

---

[২৯]যুগশ্রেষ্ঠ দ্বীনের দাঈ শায়খ হাসান আল বান্না ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মিশরের এক আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুরআনের হাফেজ এবং হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী পিতা শায়খ আহমাদ আব্দুর রহমান বান্না ছিলেন তার প্রাথমিক শিক্ষক। ৮ বছর বয়সে তিনি ইসমাইলিয়ার রাশাদ আদ-দীনিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরবী ব্যাকরণ, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এখানে তিনি ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। গণিতের শিক্ষক উস্তাদ মুহাম্মদ আফেন্দী আব্দুল খালেকের অনুপ্রেরণায় তিনি 'জমিয়তে আখলাকে আদবিয়াহ' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন। তিনি মাহমুদিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আহমাদ আফেন্দী সাকারীর সাথে 'হোজাফী কল্যাণ সংগঠন' গঠন করেন। এই সংগঠনটি সচ্চরিত্রের দিকে আহ্বানের পাশাপাশি বাইবেল মিশরের প্রতিরোধ করত। টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের দিনগুলোতে তিনি ইবাদত ও তাসাউফ শিক্ষায় ডুবে থাকতেন। এ সময়টাতে তিনি ফিকাহ, উসূল এবং হাদীসের অনেক কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। টিচার্স ট্রেনিং স্কুলের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় তিনি স্কুলে প্রথম এবং সারাদেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। রেজাল্টের পর বুহাইয়া শিক্ষাবোর্ড তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি সেখানে যোগ না দিয়ে দারুল উলুমে (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে) ভর্তি হন। এখানে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন এবং সরকারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ইসমাইলিয়াতে যোগদান করেন। এ বছরেই মার্চ মাসে তিনি গঠন করেন আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন (মুসলিম ব্রাদারহুড)। সারা মিশরব্যাপী ইখওয়ানের মিশন ছড়িয়ে পড়ে এবং সমগ্র মিশরে এর শাখা দাঁড়ায় বিশ হাজারে এবং জনশক্তির সংখ্যা ২০ লাখ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ইখওয়ানকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি শায়খ বান্নাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

Scanned by CamScanner

ইসমাইলিয়া থেকে কায়রো বদলি হন। ফলে আন্দোলনের শাখা বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই এ আন্দোলন মিশর ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশে প্রবেশ করে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিনে সমস্যা দেখা দিলে আল ইখওয়ানুল মুসলিমুন সম্ভাব্য সকল উপায়ে আরবদের সহযোগিতা করে। তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী এ আন্দোলনে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন সমগ্র আরবে ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ফিলিস্তিন যুদ্ধে আল-ইখওয়ান আরবলীগের পতাকা তলে সমবেত হয়ে অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করে। বহু ইখওয়ান সদস্য ফিলিস্তিনি রণাঙ্গনে শাহাদত বরণ করেন। ইখওয়ান ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহানুভূতি প্রদর্শন করলে ব্রিটিশ গোলাম মিশরীয় প্রধানমন্ত্রী মাহ্মুদ ফাহ্মী আল-নুকরাশী (ডিসেম্বর, ১৯৪৮) ফিলিস্তিন যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ লাভ করে ইংরেজদের খুশি করার এবং নিজ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে আল-ইখওয়ানের প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করে ইখওয়ানকে বেআইনি ঘোষণা করেন। বিশ দিন পর তিনি নুকরাশী হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এ হত্যার জন্য আল-ইখওয়ানকে দায়ী করা হয় এবং প্রতিশোধ হিসেবে ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয়।

ইংরেজ বশংবদ মিশরীয় বাদশাহ ফারুখ শুরু থেকেই এই আন্দোলন ও হাসানুল বান্না সম্পর্কে ভীষণভাবে ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। অপরদিকে ফিলিস্তিনি রণাঙ্গনে ইখওয়ানের সাহসিকতা, ত্যাগ, আন্তরিকতা ও বীরত্ব সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছিল; এমনকি আর্মি অফিসারবৃন্দকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যাহোক, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দামেস্কে ইখওয়ানের একটি শক্তিশালী শাখা ছিল এবং পরবর্তীতে সমগ্র সিরিয়াতে অনেক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে জেরুজালেমেও এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিলিস্তিনের অন্যান্য শহরেও এ আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ফিলিস্তিনি রণাঙ্গনে হাসান আল বান্না (রহ)-এর প্রতিনিধি মাহ্মুদ লাবীব যুবকদের সংঘবদ্ধ করেন এবং প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ১৫ই মে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শহীদ বান্না আহমাদ আব্দুল আজিজকে প্রেরণ করেন একদল স্বেচ্ছাসেবকসহ। এই বাহিনী ইহুদিদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

এ সময় আন্তর্জাতিক জায়নবাদ সংস্থার অধীনে ইহুদি জাতীয় তহবিল (কেরেন কায়েমৎ) ও 'প্যালেস্টাইন গঠন' তহবিল (কেরেন হেইসদ) থেকে পরিকল্পিতভাবে জমি ক্রয় করে বসতি স্থাপন করা হতে থাকে। ফিলিস্তিনে ইহুদিরা সমবায়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষি খামার গড়ে তোলে।

Scanned by CamScanner

সুসংগঠিত এই খামারগুলোতে যৌথ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও যৌথ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে একতার বন্ধন দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়। খামারগুলো মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ষীদল গঠন করে। 'হাসোমার' নামে পরিচিত এই রক্ষীদল পরবর্তীতে ইহুদিদেরকে প্রতিবেশীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'কুপাত পোয়ালাই এরেৎজ ইসরায়েল' নামে শ্রমিকদের কল্যাণে একটি তহবিল গঠন করে। শ্রমিকদের চাকরি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করে 'মিশরাদ হা-ভদা' (চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র) এবং শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজ করত প্যালেস্টাইন সংযুক্ত শ্রমিক সংস্থা। ফিলিস্তিনে সুপরিকল্পিতভাবে জমি ক্রয়ের জন্য গঠন করে ইহুদি জাতীয় তহবিল। জমি ক্রয় সম্পর্কিত সংস্থা (হে ভারাত হাবাসারাত হা-ইশুভ) এবং Anglo Palestine Bank প্রতিটি ইহুদি বসতিতে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্র, চিকিৎসালয়, অবসর বিনোদনকেন্দ্র। শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর ব্যবস্থাপনায় বহু সমবায় (হামাশবির), সমবায় বাজার (তেনুভা) ও বহু কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সোলেল বোনেই' নামে পরিচিত এর একাংশ রাস্তা-ঘাট ও দালান-কোঠা নির্মাণের ঠিকাদারি কাজে নিয়োজিত ছিল আর একটি অংশ 'জিম' নামে পরিচিত, এটি জাহাজ চলাচলের বা সামুদ্রিক পরিবহনের সামগ্রিক দায়িত্বের ওপর নিয়োজিত ছিল। ইহুদিরা তাদের বসতিগুলোকে প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে। কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারও ইহুদিদের পক্ষে যোগ দেয়। ইহুদিদের মধ্য থেকে তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ ছাড়াও ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ জনে উন্নীত করা হয়।

অপরদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক ভাবধারার বিকাশ লাভ করেনি এবং তাদের অগ্রগতির গতি ছিল অতি মন্থর। প্যালেস্টাইনে আধিপত্য বিস্তারে ইহুদিদের ছিল অতি তৎপরতা, পক্ষান্তরে মুসলিম অধিবাসীগণ ছিল নেতৃত্বহীন, মন্থর। মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠন ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ফলে মুসলিম সমাজে কূপমণ্ডূপকেন্দ্রিক রাজনীতির বিকাশ লাভ করছিল এবং অভিজাত পরিবারগুলো ভিলেজ পলিটিক্সের ন্যায় কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এখানকার বনেদী মুসলিম পরিবারগুলো নিরন্তর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে জেরুজালেম শহরের হুসাইনি ও নাশাশিবী বংশের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য। নিজেদের ক্ষমতার জন্য (জেরুজালেম শহরের মেয়রের পদ) নাশাশিবী বংশ ব্রিটিশদের সমস্ত কাজ সমর্থন করত। অপরদিকে শহরের মেয়র হুসাইনি

Scanned by CamScanner

বংশীয় মূসা কাজিম আল-হুসাইনি সামান্য সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে ফিলিস্তিনি আরবদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তবে আরবদের মধ্যে এই চেতনা ছিল যে, ফিলিস্তিন আরব ভূমি এবং সেই ভূমিতে একটি বহিরাগত জনসমষ্টির জন্য রাজ্য স্থাপন ন্যায় ও নীতিবিরোধী। উল্লেখ্য যে, অব্যাহত ইহুদি আগমন সত্ত্বেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদি জনসাধারণ ফিলিস্তিনের মোট জনসাধারণের ৩৩% এর বেশি ছিল না। তবে এরপর থেকে ইহুদি বাহিনী উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে এবং রাস্তার দুই পার্শ্বে আক্রমণ চালিয়ে হাইফা, জাফা, তাইবেরিয়া, সাফাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরব গেরিলাদের বের করে দিয়ে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা আরব গ্রামগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে থাকে। উদ্দেশ্য– ভীতি সঞ্চার করে আরবদেরই ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ড থেকে বের করে দেওয়া। এভাবে তারা চার লক্ষেরও বেশি মুসলমানকে ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয়। ক্রমান্বয়ে সংখ্যাটি আট লক্ষের দিকে ধাবিত হয়। এদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্মসংস্থা (United Nations Relief and Works Agency) গঠন করে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফিলিস্তিনিদের তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য করা হয়। আরব এলাকায় সামরিক আইন জারি করা হয় এবং বিভিন্ন আরব এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা হয়। আরব এলাকা থেকে বের হতে হলে অনুমতিপত্র নিতে হতো। সামরিক প্রয়োজনে প্রায়ই ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের তাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত শুরু করে। ইসরায়েলের অভ্যন্তরে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই ব্যাপকহারে ফিলিস্তিনিদের গ্রেফতার করে নির্যাতন চালানো হতো। আরবদের বন্দি ও পাইকারিহারে গ্রেফতার একটি নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। বছরের পর বছর এক দুঃসহ ও অমানবিক বাস্তুত্যাগী জীবনযাপনের ফলে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে স্বীয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে, অপরদিকে তাদের মধ্যে লড়াকু মনোভাবেরও জন্ম হয়েছে। অনেকের মধ্যে জন্ম নিয়েছে প্রতিশোধের স্পৃহা।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর পরাজয় জনিত চরম হতাশা ও দুর্নীতিপরায়ণ আরব সরকারগুলোর ওপর অনির্দিষ্টকালের জন্য নিজেদের ভাগ্য সমর্পণ করতে অসম্মতির ফলেই ফিলিস্তিনি যুবকদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ফাতাহ্ ও পরবর্তীতে Populer Front for the Liberation of Palestine (মার্কস্‌বাদী) এর গেরিলা বাহিনী গাজা ও অন্যান্য এলাকা থেকে ইসরায়েলের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করে বাস্তুহারা ফিলিস্তিনিদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে।

Scanned by CamScanner

ইখওয়ানুল মুসলিমুন শুরু থেকেই ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় এবং বহুবিধ কারণে ফিলিস্তিনে তাদের কার্যক্রম তার গৌরব হারিয়েছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল– মিশরীয় শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতি তাদের সীমাহীন নির্যাতন। ফিলিস্তিনি জনগণও মনে করত তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে মিশরীয় শাসকগোষ্ঠী এগিয়ে আসবে। ইসরায়েলি লিকুদ পার্টি কর্তৃক (১৯৭৭ খ্রি.) গাজাবাসীর ওপর দুর্বিষহ নির্যাতন এবং মিশরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কর্তৃক ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে বক্তব্য প্রদান ফিলিস্তিনিদের হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করে। লিকুদ পার্টি এই প্রথমবারের মতো গাজাতেও প্রথম ইহুদি বসতি গড়ে তোলে, যা পূর্ব থেকেই ঘনবসতিপূর্ণ গাজায় অমানবিক সংকট তৈরি করে। এ সময়টাতে যুবকদের এক বিরাট অংশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে ইসরায়েলি আগ্রাসন যথার্থভাবে প্রতিরোধ করা যাচ্ছিল না। এছাড়া ইসরায়েল নিজেদের স্বার্থে গাজার মানুষদের গুপ্তচর বানাচ্ছিল এবং টাকা, মাদক, যৌনতা প্রভৃতির প্রলোভন দেখিয়ে তাদের অনুগত হিসেবে তৈরি করছিল। এরই প্রেক্ষিতে গাজার ইখওয়ানের নেতৃবৃন্দ স্থানীয় জনগণের ক্ষোভকে প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনের ইখওয়ানের সকল দায়িত্বশীল ঐকমত্য গ্রহণ করেন। মূলত তারই প্রেক্ষিতে প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে হামাসের উত্থান।

এ সময়টাতে মূলত ইখওয়ানের নেতা হিসেবে শেখ আহমাদ ইয়াসিন* তৎপর ছিলেন। তিনি ফিলিস্তিনি অসহায় মানুষদের বাঁচাতে বেশ কিছু কর্মচসূচি গ্রহণ করেন। তার কর্মতৎপরতার সময় ফিলিস্তিনে ইখওয়ানের

---

*শেখ আহ্‌মদ ইয়াসিন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ফিলিস্তিনের আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তার বাবা মারা যায় এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় তার পরিবার শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। এ সময় তিনি খেলতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং আমৃত্যু পঙ্গুত্বকে বরণ করে নেন এবং হুইল চেয়ারে জীবন কাটন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তার শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেলেও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কায়রোর আইন শামস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পান। কিন্তু উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। ১৯৬৬/৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন শিক্ষক, ইমাম, কুরআনের হাফেজ এবং ইসলামিক বক্তা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ ইসরায়েলি সৈন্যরা নামাজরত অবস্থায় হেলিকপ্টার থেকে মিসাইল ছুড়ে তাকে হত্যা করে।।

Scanned by CamScanner

অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ইখওয়ানের কর্মী পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত না। বেশকিছু ইখওয়ান নেতা-কর্মী এ সময় ফাতাহ্‌তে যোগদান করে। ফাতাহ্‌রও লক্ষ্য ছিল পুরো ইখওয়ানকে তালুবদ্ধ করা। কিন্তু শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মতো পঙ্গু ও অসুস্থ মানুষটিই ইখওয়ানের প্রতি ছিলেন পূর্ণ আস্থাবান। তিনি বিশ্বাস করতেন- প্রতিরোধ আন্দোলনই মুক্তির পথ। আর এ জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি। শেখ আহমাদ ইয়াসিন ছিলেন একজন বক্তা এবং বক্তৃতার মাধ্যমেই বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর। তাছাড়া পেশায় শিক্ষক এই মহান ব্যক্তিত্বটি তার ছাত্রদেরও জাগিয়ে তুলেছিলেন। তার বক্তব্য ইখওয়ানের ভাবমর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। কেননা, এ সময় অনেকে ইখওয়ানকে ইহুদিদের দালাল হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করারও অপপ্রয়াস চালিয়েছিল এবং সাধারণ ফিলিস্তিনিরা ইখওয়ানের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। কয়েকজন ইখওয়ান এ সময় তাদের সাথে আবারও সম্পৃক্ত হয়। তিনি যেখানে নামাজ পড়াতে যেতেন, সেখানে যুবকশ্রেণি অংশগ্রহণ করত। তিনি জেরুজালেম ও গাজা থেকে বেশ কয়েকজন ইখওয়ান নেতাকর্মীকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফলতার দেখা পাননি; কেননা তারা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যায়। কিন্তু শেখ আহমাদ ইয়াসিন হতাশ ছিলেন না। তিনি তার তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। তিনি সাধারণত মসজিদে বসেই তার তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং সেই সাথে তিনি তার শিক্ষার্থীদেরকেও উদ্বুদ্ধ রাখেন। ইবরাহীম আল মাকদামাহ[৩০],

---

[৩০]ইব্রাহিম আল-মাকদামাহ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম জেরুজালেমের ইবনা (Ibna) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার প্রথমে সেখান থেকে পালিয়ে বুরেইজ (Bureij) রিফিউজি ক্যাম্পে আসে এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে তারা জাবালিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং উচ্চতর ডিগ্রি মিশর থেকে অর্জন করেন। মিশরে অবস্থানকালে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন। তিনি হামাসের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হন এবং ইসরায়েলি কারাগারে শারিরীক ও মানসিকভাবে চরম নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৯২খ্রিস্টাব্দে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং গাজায় শিফা হাসপাতালে ডেন্টিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ইসরায়েলি সৈন্যরা হেলিকপ্টার থেকে মিসাইল নিক্ষেপ করে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ তার তিন সহকর্মীসহ তাকে হত্যা করে।

Scanned by CamScanner

ইসমাইল আবু শানাব[৩১], আব্দুল আজিজ আওদাহ[৩২], ফাতহি আশ-শাকাকি[৩৩]

[৩১]ইসমাইল আবু শানাব ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গাজার নুসেইরাত রিফিউজি ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার আসকেলোনের নিকটবর্তী গ্রাম আল জেইয়া (Jayych) থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে রিফিউজি ক্যাম্পে এসেছিল। তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পাশ করেন এবং পশ্চিম-তীরের বিরজেইত (Birzeit) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের কারণে তিনি ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কায়রোর মানসুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারি-এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আমেরিকার কলোরাডো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গাজায় ফিরে আসেন এবং গাজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তিনি হামাসে যোগ দেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং দীর্ঘ কারাভোগের পর ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির পর তিনি ফিলিস্তিন ইঞ্জিনিয়ারস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। আত্মঘাতি বোমা হামলার পর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আবারও গ্রেফতার হন। এ সময় তিনি ড. রানতিসি এবং মাহমুদ জাহহারের পর হামাসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। ২১শে আগস্ট ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে দুইজন বডিগার্ডসহ তিনি ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহত হন। তিনি পাঁচ মেয়ে এবং চার ছেলের জনক ছিলেন।

[৩২]যে কয়জন মানুষ শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সংস্পর্শে আসেন, তাদের মধ্যে আব্দুল আজিজ আওদাহ অন্যতম। মিশর সরকারের অনুদানে যে প্রথম ব্যাচটি মিশরে পৌছায়, তার দলপতি ছিলেন আব্দুল আজিজ। তিনি শেখ আহমাদ ইয়াসিনের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং গাজা ইখওয়ানের প্রথম দিককার কয়েকজন সমর্থকের একজন। তিনি ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার জাবালিয়ায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরে পড়াশোনা শেষ করে গাজা প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ও মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ইখওয়ান থেকে বহিষ্কৃত হন এবং ফাতহি শাকাকির সাথে Palestinian Islamic Jihad (PIS) গঠন করেন।

[৩৩]ফাতহি শাকাকি (Fathi Shaqaqi) গাজা উপত্যকায় রিফিউজি ক্যাম্পে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার রামাল্লার নিকটবর্তী জারনুকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে এখানে আসে। ১৫ বছর বয়সে তার মা মারা যান। ফাতহি শাকাকি শেখ আহমাদ ইয়াসিনের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা উদ্বাস্তু শিবিরে অর্জন করেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দেতিনি মিশরে গমন করেন। তিনি পশ্চিম-তীরের বিরজেইট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ফাতহি শাকাকি আব্দুল আজিজ আওদাহ-এর সাথে Palestinian Islamic Jihad (PIS) গঠন করেন।

Scanned by CamScanner

ইব্রাহিম আল ইয়াজুরি[৩৪] এবং মূসা আবু মারজুক[৩৫] ছিলেন তার প্রথম দিককার অনুগামীদের অন্যতম। এদের মধ্যে আবু মারজুক, আব্দুল আজিজ আওদাহ এবং আশ শাকাকি মিশরে পড়তে গিয়েছিলেন এবং গাজার ছাত্রদের সমস্যা সমাধান কল্পে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে গাজার রাফাহ উদ্বাস্তু শিবিরে বড় হয়ে ওঠা বাশির নাফি মিশরে আসেন এবং ইখওয়ানে যোগদান করেন। তিনি অল্প সময়েই ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফিলিস্তিনের আরও কিছু নেতা

---

[৩৪]হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইব্রাহিম আল-ইয়াজুরি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গাজার দারাস গ্রামে (গ্রামটি আর শতশত গ্রামের মতো বিলুপ্ত করে দিয়েছে ইসরায়েল) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রামটিতে ইসরায়েলি সৈন্যরা হামলা করে এবং গণহত্যা চালায়। ঘরবাড়ি হারিয়ে ইব্রাহিম আল ইয়াজুরির পরিবার খান ইউনিস উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। উদ্বাস্তু শিবিরেই জাতিসংঘের অর্থায়নে পরিচালিত স্কুলে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হন। পড়াশোনা শেষ করে গাজায় ফিরে আসেন এবং একটি ফার্মেসি চালু করেন। ফিলিস্তিন ইখওয়ানের সদস্য জনাব ইয়াজুরি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে হামাসের প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সাথে ভূমিকা রাখেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে মার্চ শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সাথে ইব্রাহিম আল ইয়াজুরির বড় ছেলে মুমিন শায়েখ শাহাদাত বরণ করেন। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

---

[৩৫]১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকা রাফাহ্ উদ্বাস্তু শিবিরে জন্মগ্রহণ করেন মূসা মুহাম্মদ আবু মারজুক। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার পরিবার রাফাহ্ উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত গাজায় পড়াশোনা করেন। এরপর কায়রোতে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা শেষ করেন (১৯৭৬ খ্রি.)। আমেরিকার কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্টর ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি এবং লুইসিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং হামাস প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার হামাস শুভানুধ্যায়ীদের সাথে যোগযোগ রক্ষা করতেন এবং গাজার সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হামাসের প্রথম রাজনৈতিক ব্যুরো প্রধান নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জর্ডানে বসবাস করেন। এরপর দামেস্কে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বসবাস করেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর কায়রোতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকার জেএফকে বিমানবন্দরে গ্রেফতার হন। ইসরায়েল এ সময় তাদের হাতে তাকে তুলে দেওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুরোধ করে। সন্ত্রাসী হিসেবে মারজুক আমেরিকার তালিকাভুক্ত হন। এরপর মারজুক জর্ডানে অবস্থান করেন। জর্ডান কর্তৃপক্ষও তাকে বহিষ্কার করে। ইরান, মিশর, সুদানসহ বিভিন্ন দেশ ঘুরে তিনি শেষ পর্যন্ত তার ১৭ বছরের পুরোনো আবাস আমেরিকাতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আমেরিকাতে পদার্পণের সাথে সাথে জনএফ কেনেডি বিমানবন্দরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

Scanned by CamScanner

মিশরে আগমন করেন। তাদের অন্যতম ছিলেন ফাতহি আশ শাকাকি। আরো যুক্ত হন ইবরাহীম আল মাকদামাহ এবং সালাহ শিহাদাহ[৩৬]। ইতোমধ্যে কুয়েতও ফিলিস্তিনি ছাত্রদের একটি আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। অনেক মিশরীয় ছাত্র কুয়েতেও আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের সবার মোটামুটি একটা চিন্তা ছিল এই রকম– ফিলিস্তিনিদের ইসরায়েলি খপ্পর থেকে বের করার জন্য শরিয়াহ্‌র দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই। কেননা, মুসলমানরা শরিয়াহ্‌র পথ ছেড়ে দেওয়ার কারণেই ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন মুসলিম ভূ-খণ্ড দখলের সাহস পাচ্ছে অমুসলিমরা। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ মুসলিম যুবকদের জন্য মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম হাতে নেয় এবং মাধ্যমিক ছাত্রদের ব্যাপারে মনোযোগী হয়। কুয়েতস্থ ফিলিস্তিনি ইখওয়ান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতে ছাত্র সংগঠন চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, খালিদ মিশাল[৩৭]এই সংগঠনের প্রথম ব্যাচের একজন ছাত্র। স্কুলে দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইখওয়ানে যোগদান করেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি ছিলেন

---

[৩৬]২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ সালে হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সালাহ শিহাদা গাজায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জাদ্দিন কাসসাম ব্রিগেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ১৯৮৪ এবং ১৯৮৮ সালে ইসরায়েল কর্তৃক গ্রেফতার হন। ইয়াহিয়া আয়াসের মৃত্যুর পর তিনি শীর্ষ নেতায় পরিণত হন। প্রথম ইন্তিফাদায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসরায়েলের হাতে বন্দি হন এবং ১২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কাসসাম ব্রিগেডের নেতৃত্ব প্রদান শুরু করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুলাই ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের সদস্যরা তার বাড়ির ওপর এফ-১৬ বিমান থেকে ১ টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করলে স্ত্রী-কন্যাসহ সালাহ শিহাদা নিহত হন। সাত শিশুসহ মোট পনেরো জন এ হামলায় মারা যান এবং ১৫০ জন আহত হন। আশেপাশের প্রায় ২০টি বাড়িও এ সময় ধ্বংস হয়ে যায়।

---

[৩৭]১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মে ফিলিস্তিনের পশ্চিম-তীরে জন্মগ্রহণ করেন খালিদ মিশাল। তিনি হামাসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অন্যতম। তার পিতা আব্দুল কাদির মিশাল ছিলেন একজন ফিলিস্তিনি কৃষক এবং ইমাম। তিনি ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড ছেড়ে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কুয়েতে পাড়ি জমান। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর ইসরায়েল পশ্চিম-তীর অধিকার করলে তার পরিবার জর্ডানে চলে যায় এবং কয়েক দিন পর তার বাবার সাথে কুয়েতে গিয়ে মিলিত হয়। এখানেই মিশাল মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল্লাহ আল সেলিম মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমবারের মতো (১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর) দুই মাসের জন্য স্বীয় জন্মভূমিতে পদার্পণ করেছিলেন। এই সফর তার মনে গভীর রেখাপাত করে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। এরপর থেকে তিনি পূর্ণভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

Scanned by CamScanner

ইখওয়ানের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রমে ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে ইখওয়ানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। আর এ কার্যক্রমের সফলতা ইখওয়ানকেও উদ্বুদ্ধ করে নানা কাজে। তারা আল মাজমাউল ইসলামী বা ইসলামিক সেন্টারও খুলে বসে (১৯৭৬ খ্রি.)। মসজিদগুলোর সাথে সম্পৃক্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো গাজার স্থানীয় মানুষদের সামাজিক, চিকিৎসা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সেবা দিতে থাকে। গাজা উপত্যকায় বেশ কিছু মসজিদ, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল ও ক্লিনিক চালু হয়। ইখওয়ান খান ইউনিসেও দ্বিতীয় শাখা খোলে। ইখওয়ানের ডাক্তাররা স্বেচ্ছাসেবী ক্যাম্প খুলে চিকিৎসাসেবা প্রদান করত। ইখওয়ানের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কিন্ডারগার্টেন, কুরআনিক স্কুল এবং ক্লিনিকেরও ব্যবস্থা ছিল। ইসলামিক সেন্টারের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে গাজায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড কমিটির সভাপতি ছিলেন শেখ আহ্‌মাদ ইয়াসিন। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে গাজা উপত্যকায় ইখওয়ানের প্রভাব ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক বিরাট অংশ লোক ইখওয়ানে যোগদান করে। তবে ইখওয়ান থেকে বহিষ্কৃত ফাতহি আশ-শাকাকি গাজায় ইসলামিক জিহাদ মুভমেন্ট ইন ফিলিস্তিনি নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলে ইখওয়ানের সাথে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। অনেক ইখওয়ান কর্মী উক্ত সংগঠনে যোগদান করে। ফাতাহ্ ঘেঁষা গ্রুপ সারায়া আল জিহাদিল ইসলামী নাম দিয়ে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। সারায়া আল জিহাদও ইসরায়েলিদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিল। এসব ইখওয়ানের নেতাকর্মীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। শেখ আহমাদ ইয়াসিনও বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলেন এবং কিছু প্রতিরোধ কর্মসূচিরও চিন্তাভাবনা করছিলেন। ফিলিস্তিনের বাইরে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ইখওয়ান সমর্থক ফিলিস্তিনিরাও

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করলে তিনিসহ অন্যান্য হামাস নেতারা জর্ডানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। খালিদ মিশাল ছিলেন হামাসের পলিট ব্যুরো সদস্য এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আবু মারজুকের পর তিনি এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মোসাদের এজেন্টরা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় জর্ডানীয় প্রশাসক খালিদ মিশালসহ কয়েকজন হামাস নেতাকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ইব্রাহিম গোশেহও ছিল। পরবর্তীতে জর্ডান থেকে মিশাল বিতাড়িত হন এবং কুয়েতে প্রত্যাবর্তন করেন ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। কুয়েত থেকে পরবর্তীতে সিরিয়া চলে যান ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে মিশাল সিরিয়া ত্যাগ করে কাতার চলে আসেন। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের পর মিশাল প্রথমবারের মতো গাজায় আসেন। ব্যক্তিগত জীবনে মিশাল তিন কন্যা এবং চার পুত্র সন্তানের জনক। অনেকের মতে খালিদ মিশাল একজন রক্ষণশীল এবং আক্রমণাত্মক মানসিকতার মানুষ।

Scanned by CamScanner

ইখওয়ানের নিকট থেকে প্রতিরোধ কর্মসূচি প্রত্যাশা করছিল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের আম্মান সম্মেলনে জর্ডান, কুয়েত, সৌদি আরব, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিনিধিরাও যোগদান করে। এই সম্মেলনে ইখওয়ানকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং ৭০ হাজার ডলার অনুদান দেয়। মূলত অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিনতে এই টাকা ইখওয়ানকে প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে কিছু সদস্যকে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য আম্মানে প্রেরণ করা হয়। গাজার কিছু ইখওয়ানকর্মী প্রশিক্ষণের জন্য আম্মানে গমন করেন এবং গাজায় ফিরে আসেন। এক পর্যায়ে অস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারটি ফাঁস হয়ে যায় এবং ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে গ্রেফতার করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ইসরায়েলি আদালত শেখ আহমদ ইয়াসিনকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে এবং ড. ইব্রাহিম আল মাকদামাহকে আট বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে। ইখওয়ান কর্তৃক অস্ত্রের অর্ধেক ইসরায়েল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাকি অস্ত্রগুলো ইখওয়ান পরে প্রথম ইন্তিফাদায় (১৯৮৭ খ্রি.) ব্যবহার করেছিল। এক বছরের মাথায় বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় শেখ আহ্মাদ ইয়াসিন ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে (২০শে মে, ১৯৮৫ খ্রি.)। ইখওয়ানের কার্যক্রম মুক্তিকামী তরুণদের উদ্দীপ্ত করে। গাজায় ইখওয়ান নেতৃবৃন্দও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অপেক্ষা করছিল। এভাবে ধীরে ধীরে ইখওয়ানের শীর্ষ নেতৃত্ব ইসরায়েলকে সশস্ত্রভাবে মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন কমিটি দ্য ফিলিস্তিনি অ্যাপারেটর্স নামক একটি স্পেশালাইজড কাঠামো গঠন করে। এটি বিভিন্ন দেশে কর্মরত ফিলিস্তিনি ইখওয়ানের সমন্বয় করে। এর তিনজন নেতা পরবর্তীতে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পর) হামাসের সিনিয়র নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। তারা হলেন খালিদ মিশাল, মূসা আবু মারজুক এবং হামাসের প্রথম রাজনৈতিক মুখপাত্র ইব্রাহিম গোশেহ[৩৮]। বসে ছিলেন না শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও তার সঙ্গীরাও।

---

[৩৮]ইব্রাহিম গোশেহ ছিলেন হামাসের প্রথম রাজনৈতিক মুখপাত্র। পরবর্তীতে তিনি জর্ডান চলে যান এবং আম্মানস্থ হামাসের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জর্ডান কর্তৃপক্ষ ইসরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বের প্ররোচনায় হামাসের ওপর দমনপীড়ন বাড়িয়ে দিলে হামাস জর্ডান থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়। জর্ডান কর্তৃপক্ষ যে ৬ জন হামাস নেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছিল, তার মধ্যে ইব্রাহিম গোশেহ ছিলেন অন্যতম। পরে আত্মসমর্পণ করলে তাকে বন্দি করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত কাতারগামী একটা প্লেনে উঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে গোশেহ আবারও জর্ডানে ফিরে গিয়েছিলেন এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জর্ডানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

Scanned by CamScanner

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর নতুন সংগঠনের কার্যক্রম শুরুর একটি তারিখ নির্ধারণ করেন। এই নয়া সংগঠনের দায়িত্ব দেন সালাহ শিহাদাহকে। সংগঠনের নাম দেওয়া হয়– দ্য প্যালেস্টাইন মুজাহিদিন। এই সংগঠনটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলি সৈন্য ও অবৈধ ইহুদি বসতি। ইসরায়েলি গুপ্তচরদের পাকড়াও করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় সিনওয়ার ও রাওহি মুসতাহাকে। তারা 'আল মাজেদ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। তবে প্রথম ইন্তিফাদায় তারা তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ইসরায়েলে কাজ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী একটি গাড়িকে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের কাছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী ট্যাংক চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন শ্রমিক মারা যান। নিহত শ্রমিকদের জানাযা শীঘ্রই একটি ব্যাপক বিক্ষোভে রূপ নেয়। পরের দিন ইসরায়েলি গাড়িতে ফিলিস্তিনিরা হামলা করলে পাল্টা হামলায় আরো এক ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয় এবং ১৬ জন আহত হয়। এই বিক্ষোভ দ্রুত পশ্চিম-তীর ও পূর্ব-জেরুজালেমেও ছড়িয়ে পড়ে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ি ধ্বংস ও নিপীড়নের পথে অগ্রসর হয় এবং ৮০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করে। ফিলিস্তিনি জনগণ ইহুদি বসতিতে পাথর নিক্ষেপ, ইসরায়েলি পণ্য বর্জন, ট্যাক্স দিতে অস্বীকার, ব্যারিকেড সৃষ্টি, টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তাঘাটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই বিক্ষোভে নারী-শিশুসহ হাজারো বেসামরিক জনগণ শামিল হয়। ইসরায়েল এসব ঘটনাকে দাঙ্গা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান, রাবার বুলেট, গোলাবারুদ; এমনকি সরাসরি গুলি ছুড়ে এর জবাব দেয়। কিন্তু আন্দোলন দিনকে দিন বেগবান হতে থাকে। ইন্তিফাদার প্রথম ১৩ মাসে ৩৩২ জন ফিলিস্তিনি ও ১২ জন ইসরায়েলি নিহত হয়। পশ্চিম-তীরের স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১ বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্ল্যাক কারফিউ জারি করা হয় ১৬০০ বারেরও বেশি। ফিলিস্তিনে পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং খামার ও ঘরবারি ধ্বংস করা হয়।

ইন্তিফাদার শুরুর দিন থেকেই ইখওয়ানের সকল গ্রুপ একই সঙ্গে কর্মতৎপরতা শুরু করে। তারা ইসরায়েলি স্বার্থে আঘাত হানে এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের বিলুপ্তির অঙ্গীকার করে। ইখওয়ান তার শাখাগুলোকে একীভূত করে। শুরুর দিকে কর্মসূচি পাথর নিক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে ককটেল নিক্ষেপও চলত।

Scanned by CamScanner

প্রথমে ইসরায়েল ধারণা করতে পারেনি ইন্তিফাদা কারা পরিচালনা করছে; তবে তারা শেখ আহ্‌মাদ ইয়াসিনকে দায়ী করত। আর হামাস তাদের প্রচারপত্রে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম প্রচারণাপত্র) সংগঠনের কোনো নাম ঘোষণা করেনি। শুধু লিখেছিল– দ্য ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট। আর আরবিতে দেওয়া হয়েছিল তিনটি অক্ষর, যা ইংরেজিতে রূপান্তর করলে হয়– এইচএমএস। শব্দটি চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় হামাস হিসেবে। হামাস আরবি শব্দ। এর অর্থ আবেগপূর্ণ উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও সাহস।[৩৯] সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি বলেন, 'ইন্তিফাদার উদ্দীপনা ক্ষমতার শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা নতুন নতুন নেতা ও আইডিয়া পূরণ করে; পিএলও এলিটরা ফিলিস্তিনি রাজপথের স্পর্শহীন, মৌলবাদী ইসলাম নাসেরের সেকেলে প্যান-আরববাদের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি চরমপন্থীরা ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন (ইসলামিক রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট) হামাস গঠন করে। এটা মিশরীয় মুসলিম ব্রাদারহুডের শাখা, যারা ইসরায়েলকে ধ্বংসের জিহাদে নিবেদিত।'[৪০]

হামাসের আত্মপ্রকাশের পরপরই গ্রেফতার করা হয় খলিল আল কোয়াকে এবং লেবাননে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর গ্রেফতার করা হয় হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. আব্দুল আজিজ রানতিসি[৪১]-কে।

---

[৩৯]আলী আহমাদ মাবরুর, হামাস : ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের ভেতর-বাহির (ঢাকা : গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২০ খ্রি.), পৃ ৪৯-৯৩।

[৪০]সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮৪-৬৮৫

[৪১]আবদেল আজিজ আলী আব্দুল মজিদ আল-রানতিসি হামাসের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম নেতা। তিনি ফিলিস্তিনের সিংহ (Lion of Palestine) হিসেবে পরিচিত। তিনি শেখ আহমাদ ইয়াসিনের সাথে মিলে হামাস গঠন করেন। শেখ আহমাদ ইয়াসিনের শাহাদতের পর তিনি হামাসের রাজনৈতিক নেতা এবং মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। তাকে হত্যার জন্য ইসরায়েল ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তার গাড়ির ওপর হেলিকপ্টার থেকে বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে যান। আল-রানতিসি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর জাফার নিকট ইবনায় (Ibna) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পর তার পরিবার গাজা উপত্যকায় চলে আসেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যখন তার বয়স ৯ বছর, তখন তার চাচাকে খান ইউনিস শিবিরে হত্যা করে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি প্যাডিয়াটিক মেডিসিন জেনেটিক্সের ওপর পড়াশোনা করে প্রথম স্থান অধিকার করেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডে যোগদান করেন। তিনি গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যারাসিটোলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স-এর শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ইন্তিফাদা শুরু হলে তিনি শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও সালাহ শেহাদাহ-এর সাথে যোগদান করেন।

Scanned by CamScanner

আল মাজেদ শাখার ইয়াহিয়া সিনওয়ার[৪২] ও রাওহি মুসতাহাও গ্রেফতার হয়। সালাহ শিহাদাহ, ইব্রাহিম আল ইয়াজুরি, মুহাম্মদ শামাহ, আব্দুল ফাত্তাহ দুখান ও ঈসা আন-নাসারসহ মোট ১২০ জন শীর্ষ হামাস নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৮৯ সালে হামাসের ওপর দ্বিতীয় দফা গ্রেফতার অভিযানে শেখ আহমাদ ইয়াসিনসহ ১৫০০ নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়েছিল। দু'দফা গণগ্রেফতারে হামাসকে বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়। এরপর হামাসের পুনর্গঠনের দায়িত্বভার আমেরিকায় পিএইচ.ডি গবেষণারত মূসা আবু মারজুকের ওপর বর্তায়। কেননা, শেখ আহমাদ ইয়াসিনের ঘনিষ্ঠজন মূসা আবু মারজুক নিয়মিত গাজায় যাতায়াত করতেন। মূসা আবু মারজুক হামাসের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সাইয়্যেদ আবু মূসাহিমকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হন এবং সবকিছু স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ে আসতে সক্ষম হন।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্যান্য হামাস নেতাদের সাথে লেবাননে নির্বাসিত হন। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে গ্রেফতার হন এবং পরবর্তীতে মুক্তি লাভ করেন। হামাসের দুর্দিনে তিনি শেখ আহমাদ ইয়াসিন ও সালাহ শেহাদাহ-এর সাথে যোগদান করেন। ইব্রাহিম মাকদামাহ এবং সালাহ শেহাদাহ-এর হত্যাকাণ্ডের পর তিনিই হামাসের প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন। রানতিসিকে হত্যার জন্য ইসরায়েল হেলিকপ্টার থেকে তার গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করে (১০ই জুন, ২০০৩ খ্রি.)। তিনি আহত হন এবং তার বডিগার্ডসহ দুজন নিহত হয় এবং ২৫ জন আহত হয়। শেখ আহমাদ ইয়াসিনের শাহাদতের (২৭শে মার্চ, ২০০৪ খ্রি.) পর গাজার মুখ্য হামাস নেতা হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৭ই এপ্রিল ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ আবারো ইসরায়েলি বাহিনীর গুপ্ত আক্রমণের শিকার হন ড. রানতিসি। এবারও ভাগ্যগুণে বেঁচে যান। হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলে তার দেহরক্ষী আকরাম নাসের এবং তার ২৭ বছর বয়সী ছেলে মুহাম্মাদ মারা যায়। ছয় সন্তানের জনক ড. আব্দুল আজিজ রানতিসির স্ত্রী ফিলিস্তিনি আইন সভার একজন

---

[৪২] বর্তমান সময়ের হামাসের অন্যতম আলোচিত নেতা হলেন ইয়াহিয়া সিনওয়ার। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে খান ইউনিস রিফিউজি ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তার পরিবার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আজদাল আসকালান থেকে ইসরায়েল কর্তৃক বিতাড়িত হয়। তিনি খান ইউনিস ক্যাম্পে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারাবিক স্টাডিজ-এ সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং ২৩ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন। তিনি গাজা উপত্যকার হামাস নেতা নির্বাচিত হন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় হামাস প্রধান হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন। কট্টরপন্থী এই নেতা ইসরায়েলের সাথে সহাবস্থান নীতির ঘোর বিরোধী। তিনি কাসসাম ব্রিগেডেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

Scanned by CamScanner

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর ইসরায়েলি সৈন্যরা আল আকসা মসজিদ কম্পাউন্ডে নামাজরত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ২২ জন নামাজীকে হত্যা করে এবং এতে ২০০ ফিলিস্তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আমির সাউদ আবু সারহান তিনজন ইসরায়েলিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। অভিযোগ করা হয়– আমির হামাসের সাথে সম্পৃক্ত। ১৪ই ডিসেম্বর মারওয়ান আন জায়িঘ ও আশরাফ আল বালুজি হামাসের নামে দুজন ইসরায়েলিকে হত্যা করে এবং পালিয়ে যায়। এই আক্রমণের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ের দমন-পীড়ন শুরু করে এবং প্রায় ১৭০০ জন হামাস নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। ইতোমধ্যে কারাগার থেকে ইমাদ আল আলামি, ফাদল আল জাহার, মুস্তাফা আল ফানু ও মুস্তাফা আল লিদাভি মুক্ত হয়ে লেবাননে চলে যান এবং হামাস আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কাঠামোর আওতায় প্রবেশ করে। এরই মধ্যে ইসরায়েলি আদালত শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হামাস প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি সৈন্য হত্যা প্রভৃতি কারণে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করে।

জর্ডান থেকে হামাসের কার্যক্রম পরিচালনা

হামাসের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড কুয়েত থেকেই তত্ত্বাবধান করা হতো। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করলে হামাস তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য জর্ডানে অফিস স্থানান্তর করে। হামাসের নেতারা কুয়েত থেকে জর্ডানে চলে আসে এবং ইখওয়ানের সাথে মিলেমিশে কাজ শুরু করে। জর্ডানে হামাসের কার্যক্রম ভালোই চলছিল; কিন্তু যখন হামাস নেতা মূসা মুহাম্মদ আবু মারজুককে জর্ডানে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তারা বুঝতে পারে জর্ডানি কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম নজরদারির মধ্যে রেখেছে। এ সময় হামাস গোপনে একটি অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে। কয়েকদিনের মধ্যে জর্ডান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জেনে যায়। জর্ডান কর্তৃপক্ষ হামাসের ১১ জন কর্মীকে আটক করে। অন্যান্য হামাস নেতা জর্ডান ত্যাগ করে আমেরিকা এবং লন্ডন চলে যান। পরে রাজকীয় ক্ষমায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১১ জন হামাস নেতা-কর্মী মুক্তি পান। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে জর্ডানের সাথে হামাসের নতুন করে সম্পর্ক তৈরি হয়। হামাসের রাজনৈতিক প্রধান মূসা আবু মারজুককে তার সহকারী ইমাদ আল আলামিসহ জর্ডানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। জর্ডানের বাদশাহ, প্রধানমন্ত্রীসহ জর্ডান

Scanned by CamScanner

কর্তৃপক্ষের সাথে হামাসের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ইসরায়েল-পিএলও অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে (১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর) জর্ডানের শাসকগোষ্ঠী আচরণ পরিবর্তন করতে শুরু করে এবং জর্ডান ইসরায়েলের সাথে গোপনে সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু করে। তাছাড়া হামাসকে কাজ করতে না দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল আর পিএলও-র চাপ ছিল। এসময় বেশ কয়েকটি আত্মঘাতি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে এবং এসব নিয়ে জর্ডানের হামাস প্রতিনিধি মুহাম্মদ নাজ্জাল গণমাধ্যমে কথা বলেন। ফলে জর্ডানের সাথে হামাসের সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। তাছাড়া ইসরায়েল ও জর্ডান ওয়াশিংটন ঘোষণার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (২৫শে জুলাই, ১৯৯৪ খ্রি.) এবং নিজেদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি করে (২৬শে অক্টোবর)। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জর্ডান কর্তৃপক্ষ হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর দুই সদস্য মূসা আবু মারজুক এবং ইমাদ আল আলামিকে বহিষ্কার করে। ৩১ মে হামাস নেতা আবু মারজুক এবং ইমাদ আল আলামি জর্ডান ছেড়ে যথাক্রমে ইয়েমেন ও সিরিয়ায় চলে যান। এ সময় হামাসের অন্যতম নেতা সামি খাতির এবং ইজ্জাত আল বিসিককে গ্রেফতার করা হয়। হামাসের তথ্য মতে, ১৯৯৬-১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রায় শতাধিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। খালিদ মিশালও দামেস্ক যাওয়ার পথে জর্ডান সীমান্তে হয়রানির শিকার হন। পরবর্তীতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে খালিদ মিশাল, ইব্রাহীম গোশেহসহ বেশ কয়েকজন হামাস নেতাকে আটক করা হয়। জর্ডানের মাটিতে হামাসের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য জর্ডান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বন্দি হামাস নেতাদের একটি প্লেনে তুলে কাতার পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

আল-কাসসাম ব্রিগেড গঠন

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি দমনপীড়ন চরমে উঠলে পলাতক হামলাকারীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অনেকেই দেশত্যাগ করছিল আবার অনেকে আত্মগোপনে চলে যাচ্ছিল। এদের অনেকেই ছিল বয়সে তরুণ। এদের চিন্তা ছিল– নিজেদের স্বাধীনতা তো হারিয়েছি, তাই নতুন করে কিছু হারাবার নেই। তারা নিজেরা ছোটছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইসরায়েলিদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে তারা গঠন করে, 'কাতিব আল শহিদ ইজ্জাদিন আল কাসসাম' বা 'দ্য মার্টার ইজ্জাদিন আল কাসসাম ব্রিগেড'। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলি নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ। এটি

Scanned by CamScanner

ছিল ইন্তিফাদার সরাসরি ফসল, যা ইসরায়েলিদের প্রতিরোধের একটি সশস্ত্র শাখা। আল কাসসাম ব্রিগেড যে ছুরির যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা অব্যাহত রাখে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। এরপর থেকে টহলরত ইসরায়েলি সৈন্যের ওপরও আক্রমণ শুরু করে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারা ইসরায়েলি সীমান্ত-পুলিশের সার্জেন্ট মেজর নিসিম টোলেভানোকে অপহরণ করে এবং তার অপহরণের প্রচার করে মুক্তির জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করে। যার অন্যতম একটি দাবি ছিল– শেখ আহমাদ ইয়াসিনের মুক্তি। কিন্তু ইসরায়েলিরা তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে গেরিলারা টোলেভানোকে হত্যা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের নির্দেশ প্রদান করে এবং একদিনের মধ্যে ২০০০ ফিলিস্তিনিকে আটক করে। এর মধ্যে হামাসের ছিল ৪১৫ জন নেতাকর্মী, যাদের মধ্যে ছিল ১৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ১১ জন ডাক্তার, ১৪ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৫ জন সাংবাদিক, ৩৬ জন ব্যবসায়ী, ২০৮ জন মসজিদের ঈমাম এবং ১০৯ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সারা পৃথিবী এই বন্দি মানুষগুলোর ফুটেজ দেখেছিল। ইসরায়েলি সৈন্যরা চোখ বেঁধে, হাতকড়া পরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এদের গাড়িতে ফেলে রেখেছিল। এটা ছিল জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন, বিশ্বজুড়ে নিন্দিত হচ্ছিল। জাতিসংঘও ইসরায়েলের এসব কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায়। বিশ্ব জুড়ে হামাসের কর্মকাণ্ডের আলোচনা শুরু হয় এবং হামাস একটি আলোচিত সংগঠনে পরিণত হয়।

আল কাসসাম ব্রিগেড তাদের সাধ্যের মধ্যে সীমিত টেকনোলজি দিয়েই 'কাসসাম রকেট' তৈরি করেছে, যা দিয়ে ইসরায়েলের বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের আয়রন ডোম অ্যান্টি মিসাইল সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করেছে। অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির দেশ ইসরায়েলের প্যাট্রিয়ট মিসাইল ও এফ-১৬ এর হামলা আল কাসসামের আল-বানা, আল-বাতার, ইয়াসিন রকেট আর ট্যাংক বিধ্বংসী হালকা কিছু যুদ্ধাস্ত্রই রুখে দিচ্ছে। আল কাসসাম ব্রিগেড ড্রোন তৈরি করা শিখে গেছে এবং তারা গ্রাউন্ড কমব্যাটে যথেষ্ট শক্তিশালী।

আল কাসসাম ব্রিগেডের আত্মঘাতি স্কোয়াড

হেবরনের আল-হারাম আল-ইবরাহীম মসজিদে বারুচ গোল্ডস্টেইন নামক এক ইসরায়েলি নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হামলা চালিয়ে ২৯ জন মুসলমানকে হত্যা করে। এ ঘটনায় আরো প্রায় একশ মুসলিম আহত হয়। বর্বর এই ঘটনাটি হামাসের অনেক সদস্যকে আত্মঘাতী হামলার দিকে ঠেলে

Scanned by CamScanner

দেয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লেবাননে ইসরায়েলি আক্রমণ হলে আহমেদ কাসির নামক এক শিয়া মুসলিম গাড়ি-বোমার সাহায্যে ইসরায়েলি গভর্নরের অফিসে আত্মঘাতি হামলা করে। এতে ৭৪ জন ইসরায়েলি নিহত হয়েছিল। হামাসের সামরিক শাখা কাসসাম ব্রিগেডের সদস্যদের অনেকেই আত্মঘাতি হয়েছিল। দেশমাতৃকার জন্য এমন জীবন প্রশংসনীয় হলেও তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। এ নিয়ে হামাসকেও বিব্রত অবস্থায় পড়তে হয়েছে। মূলত এই কারণেই পশ্চিমাবিশ্ব হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। তবে এর পূর্বেই হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন (ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তির পর) ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বলেন, 'যদি ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ওপর হামলা, তাদের জমি দখল এবং বাড়িঘর ধ্বংস বন্ধ করে এবং কারাগার থেকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেয়, তাহলে আত্মঘাতী হামলা বন্ধ হবে।' এর দুই বছর পর কাসসাম ব্রিগেডও অনুরূপ প্রস্তাব করে।

হামাসের অপারেশন

২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুন দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর সৈন্যরা দুই হামাস কর্মীকে অপহরণ করে। প্রতিক্রিয়ায় হামাসের রেসিডেন্স কমিটি এবং ইসলামিক আর্মি– এই দুই সংগঠনের কর্মীরা কেরেম শ্যালম নামক ইসরায়েলি নিরাপত্তা ফাঁড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই ইসরায়েলি সৈন্যকে হত্যা এবং গিলাদ শালিত নামক এক সৈন্যকে জিম্মি করে। ইসরায়েল এই ঘটনার জন্য খালিদ মিশালকে দায়ী করে। হামাস শাতিলের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে আটক সকল ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর মুক্তি দাবি করে। গাজা ও পশ্চিম-তীরে হাজারও ফিলিস্তিনি রাস্তায় নেমে আসে। এই সমস্ত ফিলিস্তিনিরা ছিলেন ইসরায়েল কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত এবং ইসরায়েলি কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদের আত্মীয়স্বজন। ২৯শে জুন ইসরায়েলি সৈন্যরা ৬৪ জন হামাস কর্মকর্তাকে বন্দি ও অপহরণ করে। হামাস নেতা (৩০ জুন) এক বক্তৃতায় বলেন, 'হামাস কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না।'

ইসরায়েল গাজায় তাদের ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রাখে। ইসরায়েলি সৈন্যরা প্রধানমন্ত্রীর দফতর, অর্থমন্ত্রীর দফতর, পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দফতরসমূহ গুঁড়িয়ে দেয়। তবে ইসরায়েলি বর্বরতার কাছে নতি স্বীকার না করে গাজার সমস্ত মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে আসে। আন্তর্জাতিক

Scanned by CamScanner

পরাশক্তি হামাসের ওপর নতুন করে অবরোধ আরোপ করে। আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইসরায়েল আব্বাসকে সমর্থন করে এবং হামাস সরকারকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানায়।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় তেরো

স্বাধীনতাকামী দুই সংগঠন : হামাস-ফাতাহ্ দ্বন্দ্ব

প্রথম ইন্তিফাদার পর ফিলিস্তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে হামাসের আবির্ভাব রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। পশ্চিম-তীর এবং গাজার মানুষদের প্রতি বর্বর ইসরায়েলের অসহনীয় নির্মম নির্যাতনের প্রেক্ষিতে হামাসের উত্থান ঘটে। হামাস মনে করে, ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে পিএলও কিংবা ফাতাহ্ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন ফাতাহ্-পিএলও এর ভূমিকায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কেননা, যুক্ত সংগঠনদ্বয় লড়াইয়ের মাঠ থেকে সমঝোতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল। ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর দিনই মাহমুদ আব্বাস পিএলও'র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তবে ফাতাহ্র ইয়াং গ্রুপ চাচ্ছিল ইন্তিফাদায় সক্রিয় ভূমিকাপালনকারী ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি মারওয়ান বারঘোতি চেয়ারম্যান হোক। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হামাস অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যান্য ছোট দলগুলোও নির্বাচন থেকে দূরে থাকে। মাহ্মুদ আব্বাস ৬২.৩২% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে হামাস ভালো ফলাফল অর্জন করলে ফাতাহ্ গ্রুপ নড়েচড়ে বসে এবং ফাতাহ্-হামাসের মধ্যে টানাপোড়ন শুরু হয়। আসলে এই টানাপোড়েনের জন্য এককভাবে ফাতাহ্কেই দায়ী করা যায়। কেননা, হামাসের উত্থানকে তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। তাছাড়া হামাসের গঠনতন্ত্র[৪৩] অনুযায়ী তারা পিএলও বা ফাতাহ্র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয়। প্রথম ইন্তিফাদার পূর্ব পর্যন্ত পিএলও

[৪৩] হামাস সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পিএলও হলো হামাসের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তারা আমাদের ভাই, পিতা, আত্মীয় বা বন্ধু। একজন মুসলিম কি কখনো তার ভাই, পিতা, আত্মীয় বা বন্ধুকে আঘাত করতে পারে? আমাদের জাতি এবং অবস্থান এক, গন্তব্য এক; এমনকি আমাদের শত্রুও একই। আমরা পিএলও-কে সম্মান করি এবং আরব-ইসরায়েলি সংগ্রামে তাদের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখার সুযোগ নেই। যদি কখনও পিএলও ইসলামকে তাদের আদর্শ হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে এক হয়ে তাদেরই সেনা হিসেবে কাজ করব। উৎস: আলী আহমাদ মাবরুর, হামাস, প্রাগুক্ত, প ১১৯।

Scanned by CamScanner

কখনোই কাউকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে অনুধাবন করেনি। কিন্তু হামাসের কর্মকাণ্ডে তারা হামাসকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করে। ইয়াসির আরাফাত হামাসকে পিত্রলও'র প্যারালাল আরেকটা আন্দোলন মনে করত এবং সুযোগ পেলেই কঠোর ভাষায় হামাসের সমালোচনা করত। তিনি হামাসকে পিএলও'র সাথে অঙ্গীভূত হবারও আহ্বান জানান। কিন্তু হামাস তা প্রত্যাখ্যান করে। আবার পিএলও ইসরায়েলের সাথে অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে হামাস এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে এবং এটাকে ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে প্রতারণা বলে তা প্রত্যাখ্যান করে। আল কাসসাম ব্রিগেডের কমান্ডার ইয়াহিয়া আয়াশের হত্যাকারী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামাস অপারেশন শুরু করলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ হামাসের এক হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এবং হামাসের অসংখ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। পিএলও-এর এসব আচরণ হামাস প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকেও ক্ষিপ্ত করে তোলে। ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং এই অবনতি চরম আকার ধারণ করে ২০০৬ সালের আইনসভা নির্বাচনে ফাতাহ্‌র ভরাডুবির পর। ফাতাহ্‌র সঙ্গে লড়াইয়ের পর হামাস গাজার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস কৌশলে বহুবার গাজার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হামাস তাদের পাতা ফাঁদে কখনও পা দেয়নি। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে হামাস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে ফাতাহ্‌ও সরকারে যোগদান করতে আগ্রহী হয় এবং কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব নিয়ে ফাতাহ্‌ প্রতিনিধি জিরবিল আল রাজুব হামাস নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে। হামাস সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে পরাজিত ফাতাহ্‌র ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। ফাতাহ্‌ কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিল না– তারা বাদে অন্য কেউ এ অঞ্চলের প্রশাসক হবে। হামাস সরকার গঠন করলে ফাতাহ্‌ রিভোলিউশনারি কাউন্সিল এই সরকারকে বয়কট করার এবং যত দ্রুত সম্ভব পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট আব্বাস ছিলেন ফাতাহ্‌ সমর্থক। ফাতাহ্‌-ইসরায়েল-মাহমুদ আব্বাস কেউই হামাসের অগ্রগতি প্রত্যাশা করে না। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে অনড় হামাস দিনকে দিন জনপ্রিয় দল হিসেবে এগিয়ে যায়। ফাতাহ্‌ গেরিলারা তৎপর হয়ে ওঠে এবং গাজায় আইন শৃঙ্খলার পরিবেশ বিঘিয়ে তোলে। প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে বিদেশি অর্থ সাহায্য আনা এবং রোড ম্যাপ অনুযায়ী ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। রোডম্যাপের অন্যতম বিষয় হলো ফিলিস্তিন কর্তৃক ইসরায়েলকে স্বীকৃতি

Scanned by CamScanner

প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ অস্ত্র-বিরতি কার্যকর করা। কিন্তু হামাস কিছুতেই এই বিষয়ে ন্যূনতম ছাড় দিতে নারাজ। একে কেন্দ্র করে পশ্চিম-তীর ও গাজা ভূ-খণ্ডে উপদলীয় সংঘাত বেঁধে যায়। উপরন্তু গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় ৯ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। ফাতাহ্ ও হামাসের দলের উত্তেজনা হ্রাসের জন্য ইসমাইল হানিয়া এবং মাহমুদ আব্বাস এক সভায় মিলিত হয়। এখানেও ইসরায়েলকে স্বীকৃতির ব্যাপারে ইসমাইল হানিয়া ভিন্নমত পোষণ করেন। এই বিষয়ে একটি গণভোট দেওয়ার প্রস্তাব করেন মাহমুদ আব্বাস। যদিও ইসমাইল হানিয়ার বক্তব্য ছিল, গণভোটের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হবে, যা কাম্য নয়। ২৬শে জুলাই গণভোটের তারিখ নির্ধারিত হয়। গণভোটকে কেন্দ্র করে ফাতাহ্ ও হামাসের মধ্যে রামাল্লায় সংঘর্ষ বেঁধে যায়।

মাহমুদ আব্বাস প্রশাসন কিছু ডিগ্রি জারি করার মাধ্যমে হামাস সরকারের বেশকিছু প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা খর্ব করে এবং আন্তর্জাতিক মহলের আর্থিক সহায়তা ও সমর্থনে হামাস সরকারের প্যারালাল আরেকটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি ১০ হাজার সদস্যের বিশাল একটি প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড গঠন করেন। খালিদ মিশাল মাহমুদ আব্বাসের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ফাতাহ্কে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এতে ফাতাহ্ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং মিশালকে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে। ফাতাহ্ পশ্চিম-তীরে বেশ কয়েকটি সমাবেশের আয়োজন করে (৬ই অক্টোবর, ২০০৬ খ্রি.)। এতে করে হামাস-বিরোধী ফাতাহ্কে ইসরায়েল, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন উস্কে দেয়। এভাবে যে দলটি ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে জন্ম নিয়েছিল, তারাই আবার আগ্রাসী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়। পরবর্তী মাসগুলোতে উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং হামাস ও ফাতাহ্-এর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতও শুরু হয়; এমনকি ইসমাইল হানিয়াও অজ্ঞাত বন্দুকধারীর আক্রমণের শিকার হয়। হানিয়ার দেহরক্ষী মারা যায় এবং তার ছেলে ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা আহত হয়। হামাস এই হামলার জন্য ফাতাহ্কে দায়ী করে। এরপর থেকে হামাস ও ফাতাহ্র মধ্যে সংঘর্ষ নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। এসব সংঘর্ষে উভয় পক্ষে ১৩০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। ফাতাহ্ কর্মীরা গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

Scanned by CamScanner

হামাস ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিলিস্তিনকে দেওয়া আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেয়। ফলে ফিলিস্তিনের– বিশেষ করে গাজার জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী (২২শে জুন, ২০০৬ খ্রি.) এহুদ এলমার্টের সাথে জর্ডানে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইসরায়েলের প্রত্যাশা– হামাস ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের ভিত্তিতে রোড ম্যাপ প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু হামাস তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। এমতাবস্থায় ফিলিস্তিনিদের একটি গ্রুপ পশ্চিম-তীর ও গাজার মধ্যবর্তী একটি চৌকিতে হামলা চালিয়ে ২ জন ইসরায়েলি সৈন্যকে হত্যা এবং একজনকে অপহরণ করে। এরই প্রেক্ষিতে ইসরায়েল ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও বিমান সহকারে গাজায় আক্রমণ করে এবং প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার ঘোষণা দেয়। হানিয়ার অফিস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুঁড়িয়ে দেয়। হামাস মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রীসহ শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে। আমেরিকা ইসরায়েলের এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম পূর্ণ সমর্থন করে। অবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হলে সৌদি বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ সমঝোতার লক্ষ্যে হামাস এবং প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে মক্কা শরীফে আমন্ত্রণ জানান। উভয়পক্ষ আলোচনার পর একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন (৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ খ্রি.); এটি মক্কাচুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তি অনুযায়ী ফাতাহ্ এবং হামাস বেশ কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায়। গাজার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, সমঝোতার ভিত্তিতে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বাদশাহ আব্দুল্লাহ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তার ডানপাশে ছিল মাহমুদ আব্বাস এবং বামপাশে হামাস নেতা খালিদ মিশাল। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ফিলিস্তিনি ঐক্য সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'এই চুক্তি সহিংসতা বন্ধ ও ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে।'

সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়। ফাতাহ্‌র প্রতিনিধিরাও সেই সরকারে যোগদান করে। অর্থ ও পররাষ্ট্র পদে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছান। জিয়াদ আবু আমরকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সালদি ফাতাদকে অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মূলত হামাসকে কোণঠাসা করতে বিশ্বমোড়লদের কারসাজি এগুলো। পুরো ফিলিস্তিনের ওপর মাহমুদ আব্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা

Scanned by CamScanner

বাহিনীকে ইসরায়েলের পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন তদারকিতে আনতে এমন তৎপরতা। তারা হামাসকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে সব ধরনের অসহযোগিতা এবং অবরোধের আশ্রয় নেয়। বিদেশি রাষ্ট্রগুলো এই সরকারের সেইসব মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করত, যারা হামাসের নয়। মোহাম্মদ দাহলানের মিলিশিয়া গ্রুপ এবং প্রেসিডেন্ট আব্বাসের গ্রুপকে আমেরিকা ও ইসরায়েল মদদ দিত। এসব পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার কার্যকর হয়ে পড়ে। ফাতাহ্ অব্যাহতভাবে গাজায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে থাকলে বাধ্য হয়ে হামাস সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এবং পাঁচদিনের মধ্যে গাজায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফাতাহ্র মিলিশিয়াসহ সব সশস্ত্রগ্রুপ হামাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস জাতীয় ঐক্য সরকারের বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন দূত প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে অবগত করেন, তিনি যদি একটি হামাসমুক্ত সরকার গঠন করেন, তাহলে ফিলিস্তিনের ওপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হবে। মাহমুদ আব্বাস সালাম কারাদরের নেতৃত্বে (ঐকমত্য সরকারের অর্থমন্ত্রী) ফিলিস্তিনে নতুন সরকার গঠন করেন। সেই থেকে গাজা অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। ইসরায়েল তাৎকালীন গাজার পানি, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়; পশ্চিম-তীর থেকে গাজাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সেই থেকে এই বিশাল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা দুটি ইসরায়েলের প্রতিনিধি হয়ে হামাস ও পিএলও নিয়ন্ত্রণ করছে। হায়! ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ফাতাহ্র এক সিনিয়র নেতা দুঃখ করে বলেন, 'মাসের পর মাস যাচ্ছে, আমরা কিছুই অর্জন করতে পারছি না। কোনো নির্বাচন হলো না, হামাসের সাথে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারলাম না। শান্তি প্রক্রিয়ার আলোচনাও আর অগ্রসর হলো না। দিন যতই যাচ্ছে, মাহমুদ আব্বাসের সমর্থন ততই প্রান্তিক পর্যায়ে নেমে আসছে।'[৪৪]

[৪৪] ইয়াহুইয়া আরমাজনী, মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান, অনুবাদ : মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক (ঢাকা : জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৭), পৃ ২২৭।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় চৌদ্দ

হামাসেই আছা : মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ঘৃণা ও শত্রুতা ভুলে পিএলও ও ইসরায়েল এক শান্তিচুক্তির (অসলো চুক্তি) দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর। প্রায় তিন হাজার দেশি-বিদেশি অতিথির উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল পরস্পরের শত্রুতা ভুলে এক স্বায়ত্তশাসন চুক্তিতে উপনীত হয়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের পক্ষে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন প্যারেজ এবং পিএলও-এর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের পক্ষে পিএলও প্রতিনিধি মাহমুদ আব্বাস এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আমেরিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল গাজা উপত্যকা, জর্ডান নদীর পশ্চিম-তীরের জেরিকো শহরকে পাঁচ বছরের জন্য সীমিত স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হয় এবং উক্ত অঞ্চল থেকে ইসরায়েল সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করবে এবং ফিলিস্তিনিরা ১০ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে ভূ-খণ্ড দুটির প্রশাসন পরিচালনা করবে। ২০ হাজার ফিলিস্তিনি পুলিশের একটি বাহিনী এখানকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কর ব্যবস্থা ও পর্যটন দেখবে স্থানীয় প্রশাসন। চুক্তিটি গ্রহণযোগ্যতা পেলেও বিরোধিতা করে পিএলও সংস্থা থেকে ৫ জন পদত্যাগ করে। হামাসসহ অনেক সংগঠন চুক্তিটির বিরোধিতা করে। তবে কিশোর-তরুণরা চুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছিল অনেক বেশি। কেননা, প্রায় ৫০ লক্ষ ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবেতর জীবনযাপন করছিল।

এ সময় বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু

লেবানন : ৩,৩৮,৯০০; ইসরায়েল : ৬,৪০,০০০; গাজা : ৭,২১,০০০; পশ্চিম-তীর ও পূর্ব-জেরুজালেম : ১১,০০,০০০; জর্ডান : ১৫,৭০,০০০;

Scanned by CamScanner

সৌদি আরব : ১,৫৬,৬০০; সিরিয়া : ৩,০১,০০০; ইরাক : ২৪,০০০; সংযুক্ত আরব আমিরাত : ৫০,০০০; কুয়েত : ৫০,০০০; কাতার : ৩৩,৫০০; কানাডা : ১৫,০০০; লিবিয়া : ২৪,০০০; আমেরিকা : ২,১০,০০০; বিশ্বের অন্যান্য দেশ : ১,২১,৩০০।

এ বিপুল উদ্বাস্তুদের মনে অবশ্যই স্বদেশে ফেরার স্বপ্ন জেগেছিল। কিন্তু ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তির প্রবক্তা আইজ্যাক রবিন এক ইহুদি চরমপন্থীর হাতে নিহত হন। ফলে শুরুতেই চুক্তিটি ধাক্কা খায়। নতুন প্রধানমন্ত্রী হন শিমন প্যারেজ এবং ঘোষণা করেন– স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু হামাসসহ সকল চরমপন্থী সংগঠনের কার্যক্রম অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। শুরু হয় অচলাবস্থার। তবে ২৩-১০-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, জর্ডানের বাদশাহ হোসেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন একটি শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করলে দীর্ঘ ১৯ মাসের শান্তি প্রক্রিয়ার অচলাবস্থার অবসান হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল পশ্চিম-তীরের ১৯ শতাংশ ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের ঘোষণা দেয়; যদিও পরবর্তীতে সেই চুক্তি তারা পালন করেনি। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে বেনজামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার পতন হয় এবং ইহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিন হন। বারাক ঘোষণা দেন, পূর্ব-জেরুজালেমে ইহুদি বসতি স্থাপনে ইসরায়েলের অধিকার আছে এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময় এখনো আসেনি। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ফিলিস্তিন-ইসরায়েল একটি চুক্তি (২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৮ খ্রি.) স্বাক্ষর করে। ফিলিস্তিনিদের দাবি ছিল– জেরুজালেম তাদের রাজধানী হবে; ইসরায়েল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব সীমানায় ফিরে যাক; বিশ্বের উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া ফিলিস্তিনিরা ফিরে আসুক। কিন্তু ইসরায়েলের দাবি, ফিলিস্তিনিরা শুধু গাজা আর জেরিকোতে থাকুক এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর যারা উদ্বাস্তু হয়েছে, তারা ফিরে আসুক। এ সময়ই কট্টরপন্থী এরিয়েল শ্যারন (২০০১ খ্রি.) প্রধানমন্ত্রী হন এবং আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় আসেন। উভয় ব্যক্তিই ফিলিস্তিনিদের ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। শুরু হয় দ্বিতীয় ইন্তিফাদা।[৪৫]

---

[৪৫] কট্টরপন্থী লিকুদ পার্টির নেতা এ্যারিয়েল শ্যারন ২০০০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাদ্দাসে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করলে দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয়। একে ফিলিস্তিনিরা চরম অবজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করে। ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে পশ্চিম-তীর ও গাজায় গুলিবর্ষণ করে ইসরায়েলিরা। ফিলিস্তিনিরা পাথর ছুড়ে সৈন্যদের অবরোধ করে। ইসরায়েলি সৈন্যরা গ্যাস, রাবার বুলেট ও জলকামান ব্যবহার করে। পরবর্তীতে

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতাকামী হামাস ইসরায়েল অধিকৃত অঞ্চলসমূহে বিশেষ করে পশ্চিম-তীর এবং গাজায় ইহুদি বসতি লক্ষ্য করে আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু করে এবং অবিরাম মর্টার হামলা চালাতে থাকে। বহু ইহুদি এতে প্রাণও হারায়। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ইয়াসির আরাফাত হামাস নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের শরণাপন্ন হন এবং সমঝোতা বৈঠকে মিলিত হন। শেখ আহমাদ ইয়াসিনের আহ্বানে হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলে হামলা বন্ধ করে। তবে হামাস প্রতিরোধের ভাষা ফাতাহ্‌র চেয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর করে। ধীরে ধীরে ইহুদিরা হামাসকে সমীহ করতে শুরু করে। পশ্চিমা বিশ্বও হামাসকেই অধিক শক্তিশালী মনে করতে থাকে। ইতোমধ্যে হামাস (৮ই ডিসেম্বর, ২০০১ খ্রি.) ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে জেরুজালেম ও হাইফাতে ২৭ জন ইহুদিকে হত্যা করে। ফলে এবার ইসরায়েল গাজায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ্যারিয়েল শ্যারন ও জর্জ বুশ আরাফাতের ওপর আস্থা হারিয়ে মাহ্‌মুদ আব্বাসের (মার্কিন লবির লোক) দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য তৎপরতা শুরু করে। চাপের মুখে ইয়াসির আরাফাত মাহমুদ আব্বাসকে (আবু মাজন) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যে দখলদার ইসরায়েল হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে শহীদ করে দেয়। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ ১০ জন ইহুদিকে হত্যা করে। যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবে শ্যারন গাজা ভূ-খণ্ড থেকে একতরফাভাবে ইহুদি সৈন্য ও অধিবাসীদের সরিয়ে নেয়। যে কৌশলেই শ্যারন পিছু হটুক না কেন–এটা ছিল হামাসের জন্য এবং শেখ আহমদ ইয়াসিনের জন্য একটি মরণোত্তর বিজয়। এরপর থেকে ইয়াসির আরাফাত কার্যত রামাল্লায় তার সদরদফতরে বন্দি হয়ে পড়েন। ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পিএলও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত মারা যান। ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যুর পর মাহমুদ আব্বাস সর্বসম্মতিক্রমে পিএলও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ফিলিস্তিনিরা আত্মঘাতী বোমা হামলা শুরু করে। ইহুদি সৈন্যরাও ট্যাংক এবং বিমান ব্যবহার করে। এতে ব্যাপক হতাহত হয়। প্রায় ৩ হাজার ফিলিস্তিনি এবং ১ হাজার ইহুদি মারা যায়। এতে ৬৪ জন বিদেশিও নিহত হয়। ইসরায়েলি হামলায় ১০ হাজারের ঊর্ধ্বে ঘরবাড়ি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলা এই ইন্তিফাদা আল-আকসা ইন্তিফাদা নামেও পরিচিত। শারম আল শেখে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন একটি সমঝোতা ঘোষণা করলে (৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ খ্রি.) এর অবসান ঘটে।

Scanned by CamScanner

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হামাসের তেমন অংশগ্রহণ ছিল না। তবে স্থানীয় নির্বাচনে হামাস ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি গাজা পৌর কাউন্সিলের নির্বাচনে হামাস ৭৮টি আসনে (মোট আসন ১১৮টি) বিজয় লাভ করে। এরপরই সংগঠনটি আইনসভার নির্বাচনে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হামাসের মুখপাত্র নির্বাচনে যাবার ঘোষণা দেন ১২ই মার্চ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি আইনসভা নির্বাচনের ঘোষণা দেন। প্রচণ্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে হামাস জয়লাভ করে। হামাস ৪৪.৪৫% ভোট পায় এবং ১৩২টি আসনের মধ্যে ৭৪টি আসন লাভ করে। ফাতাহ্ পেয়েছিল ৪১.৪৩% ভোট এবং ৪৫টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য প্রয়োজন ছিল ৬৭টি আসন। ফাতাহ্ বেথেলহাম, জেরুজালেম এবং রামাল্লায় অধিক সংখ্যক আসন পেয়েছিল। বাকি অঞ্চলে হামাসই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

এক নজরে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম জাতীয় সংসদের ফলাফল

দল	প্রাপ্ত ভোট	শতকরা (%)	মোট আসন
হামাস	৪,৪০,৪০৯	৪৪.৪৫%	৭৪
ফাতাহ্	৪,১০,৫৫৪	৪১.৪৮%	৪৫
আবু আলী মোস্তফা	৪২,১০১	৪.২৫%	৩
অল্টারনেটিভ	২৪,৯৭৩	---	২
স্বাধীন ফিলিস্তিন	২৬,৯০৯	---	২
অন্যান্য (স্বতন্ত্র)	---	---	৪

ইসমাইল হানিয়ার সরকার গঠন

নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে ফাতাহ্‌র প্রধানমন্ত্রী আহমেদ কুরেই পদত্যাগ করেন এবং হামাসকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। হামাসের পূর্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ফাতাহ্। স্বাধীনতা আন্দোলন পন্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাহ্-র সাথে হামাসের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। ভোগবাদী ফাতাহ্ নিয়ন্ত্রিত

Scanned by CamScanner

প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল দুর্নীতি, যা ফাতাহ্‌র প্রতি মানুষের আস্থা বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ফাতাহ্ সমর্থক ছিলেন মাহ্‌মুদ আব্বাস। আর তার সামনে ছিল সমস্যার পাহাড়। শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, ইসরায়েলের সঙ্গে সহাবস্থান; শান্তির জন্য দরকষাকষি আবার নিজেদের স্বার্থেই জনপ্রিয় স্বাধীনতাকাম্য সংগঠন হামাসকে কোণঠাসা রাখার নীতি– সব মিলিয়ে জনমত হামাসের অনুকূলেই বইতে থাকে। বিভিন্ন ইন্তিফাদায় স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি প্রাণ হারায়, কিন্তু ইসরায়েলকে রোখার কেউ ছিল না; এক্ষেত্রে হামাসই আগ্রাসী ইসরায়েলকে যতটুকু শায়েস্তা করার করত। যদিও ওগুলো ছিল যৎসামান্য (চার বৎসরের ইন্তিফাদায় ইসরায়েল ৩০০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছিল, পক্ষান্তরে হামাস ১০০০ ইহুদি নিধন করেছিল)। তাই স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিরা নিজেদের মুক্তির জন্য হামাসের ওপরই আস্থা রেখেছিল।

নির্বাচনে জয়লাভ করে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া[৪৬] প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ২০শে ফেব্রুয়ারি তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মাহ্‌মুদ আব্বাসের সাথে

---

[৪৬]ইসমাইল আবদেল সালাম আহ্‌মেদ হানিয়া হামাসের সিনিয়র নেতা এবং গাজায় তিনবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি গাজায় আল-শাতি (Al-Shati) রিফিউজি ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃগৃহ আসকালানে অবস্থিত, যা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের পর ইসরায়েল দখল করে নিয়েছে। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলে। তিনি গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি হামাসের সাথে যুক্ত হন (১৯৮৫/৮৬ খ্রি.)। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের ছাত্র শাখার প্রধান ছিলেন। তিনি ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল টিমের মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতেন। প্রথম ইন্তিফাদা শুরু হলে তিনি এতে অংশগ্রহণ করেন এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ মাস এবং পরবর্তীতে আরও তিন বছর ইসরায়েলি কারাগারে ছিলেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এরপর ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ অন্যান্য হামাস নেতা–আবদেল আজিজ রানতিসি, মোহাম্মদ জাহহার, আজিজ দুয়াকসহ এরকম ৪০০ হামাস কর্মীর সাথে তাকে লেবাননে নির্বাসিত করে। এক বছর পর তিনি গাজায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং গাজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে ইসরায়েল জেল থেকে মুক্তি দিলে (১৯৯৭ খ্রি.) ইসমাইল হানিয়া তার অফিসপ্রধান নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পর হানিয়া ইসরায়েলের টার্গেটে পরিণত হয় এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এতে ইসমাইল হানিয়া সামান্য আহতও হন। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে তিনি হামাসের শীর্ষ নেতা নির্বাচিত হন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারির নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৩ সন্তানের জনক হানিয়ার পরিবার এখনও গাজার রিফিউজি ক্যাম্পে বসবাস করে। ইসমাইল হানিয়া ঠান্ডা মাথার ও উদার মানসিকতার মানুষ এবং হামাসের পরীক্ষিত নেতা।

Scanned by CamScanner

সাক্ষাৎ করেন এবং ২৯শে মার্চ শপথ নেন। ফাতাহ্-হামাস দ্বন্দ্বের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন রাষ্ট্রপতি মাহ্মুদ আব্বাস তাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু ইসমাইল হানিয়া আদেশ মেনে নেননি এবং গাজায় প্রধানমন্ত্রিত্ব করতে থাকেন।

নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ফাতাহ্ অযথাই সংঘর্ষ বাঁধিয়ে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়; এতে সাধারণ ফিলিস্তিনির জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাছাড়া এ সময় বহু ফিলিস্তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত, মাদকাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশসমূহ হামাসকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছে। আবার হামাসও চায় ইসরায়েলের উচ্ছেদ সাধন। মাহ্মুদ আব্বাস চায় অর্থ, অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা; ইসরায়েল চায় পূর্ণ অস্ত্র-বিরতি কার্যকর, গাজায় এবং পশ্চিম-তীরে অধিক বসতি স্থাপন। আব্বাসের ওপর চাপ আসে– গাজা আর পশ্চিম-তীর নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন, ইসরায়েলি সৈন্য ও বসতি স্থাপনকারীদের পশ্চিম-তীরে পুনর্বাসন। কিন্তু হামাস এগুলোর কিছুতেই বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার পক্ষপাতি না। শুরু হয়ে যায় গাজা এবং পশ্চিম-তীরে নজিরবিহীন উপদলীয় সংঘাত। ইসরায়েলও শুরু করে বিমান হামলা। এই চরম অবস্থায় ফাতাহ্ ও হামাসের মধ্যকার উত্তেজনা লাঘবে প্রেসিডেন্ট মাহ্মুদ আব্বাস এবং প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া এক সভায় মিলিত হন। এ সভায় ইসরায়েলকে স্বীকৃতির ব্যাপারে ইসমাইল হানিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

অবশেষে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য হামাস-ফাতাহ্ একটি গণভোটে উপনীত হওয়ার সিদ্ধান্তে আসে। কিন্তু গণভোটকে কেন্দ্র করে ফাতাহ্ ও হামাস সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ২০ জন পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে। ওদিকে হামাস ক্ষমতায় আসায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফিলিস্তিনকে দেওয়া সমস্ত আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেয়। অনুদান বন্ধের ফলে ফিলিস্তিনি জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। হামাস ইসরায়েলি নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা চালিয়ে দুজন সৈন্যকে হত্যা ও এক জনকে অপহরণ করলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হানিয়াকে হত্যার হুমকি দেয় এবং প্রতিশোধের জন্য অগ্রসর হয়। ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও বিমান সহকারে একযোগে হামলা করে। প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়ার অফিস ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বোমার আঘাতে উড়িয়ে দেয়। হামাস মন্ত্রিসভার ডজন খানেক মন্ত্রীসহ শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে ইসরায়েল এবং তাদের আটককৃত

Scanned by CamScanner

সৈন্যকে অক্ষত ফেরত না দিলে সব বন্দিকে হত্যার হুমকি দেয়। শেষ পর্যন্ত সৌদি বাদশাহ্‌র মধ্যস্থতায় ফাতাহ্-হামাস-ইসরায়েল সমঝোতা হয়। তবে কোনো কিছুতেই হামাসকে নমনীয় করতে ব্যর্থ হয় ইসরায়েল ও তাদের দোসররা। হামাসকে নির্মূল বা ক্ষমতাহীন করার অনেক গোপন এজেন্ডা নিয়ে মাহ্‌মুদ আব্বাস ক্ষমতায় এসেছিল। ফিলিস্তিনি পুলিশ দিয়ে হামাসকে হয়রানি; হামাসকর্মী দিয়ে জেলখানাগুলো পূর্ণ রেখেও কিছুতেই মাহ্‌মুদ আব্বাস ইসরায়েলের সহানুভূতি পায়নি। দিন যত যাচ্ছে, ফাতাহ্ আর মাহ্‌মুদ আব্বাসদের অর্জন যেন প্রান্তিক পর্যায়েই নেমে যাচ্ছে।

নির্বাচনের পর ইসরায়েল অর্থনৈতিক অবরোধসহ ফিলিস্তিন জাতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক কিছু পদক্ষেপ নেয়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ এলমার্ট ঘোষণা দেয় যে, ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাসিক কর ইসরায়েল হস্তান্তর করবে না। হানিয়া অবরোধ উপেক্ষা করে বলেন, হামাস নিজেকে নিরস্ত্র করবে না এবং ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেবে না। তিনি মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এবং ইসরায়েলের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সন্ধির প্রস্তাব করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে পূর্ব-ফিলিস্তিনি সীমানা মেনে নিতে এবং আন্তর্জাতিক বয়কট প্রত্যাহারের আবেদন করেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এই হামাস সরকার বর্তমানে তৃতীয় মেয়াদে বিদ্যমান।

- প্রথম হামাস সরকার ২০০৭-২০১১ (গাজায় হামাস প্রশাসন)
- দ্বিতীয় হামাস সরকার সেপ্টেম্বর ২০১২-২০১৫ (গাজায় হামাস প্রশাসন)
- তৃতীয় হামাস সরকার (২০১৬- বর্তমান) (গাজায় হামাস প্রশাসন)

এটি উপমন্ত্রী, মহাপরিচালক এবং অন্যান্য উচ্চ-স্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের রামাল্লার প্রশাসক হামাস সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবুও হামাস নিজেদের মতো করে নিজেদের সরকারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হামাস সবসময় অসহায় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে। ইসরায়েলি আক্রমণে ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিলে তৎক্ষণাৎ সেগুলো মেরামত করে দেওয়ার চেষ্টা করে। শহীদ ও পঙ্গু পরিবারগুলোকে ভাতা দিয়ে থাকে। শহীদ পরিবারগুলোকে ৫০০ থেকে ৫০০০ ডলার পর্যন্ত ভাতা দিয়ে থাকে। মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বানের জন্য 'ফাদিলা' নামক কমিটির মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এই কমিটি মানুষকে ইসলাম মানতে উদ্বুদ্ধ করে, কিন্তু জোরপূর্বক ইসলাম মানতে বাধ্য করে না। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হামাসের

Scanned by CamScanner

সাফল্য প্রশংসনীয়। গাজায় শিক্ষার হার ৯৯%। এখানে ৬৮৩টি স্কুল এবং পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। হামাস পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। শুধু গাজা নয়, ফাতাহ্ শাসিত পশ্চিম-তীরেও হামাসের এ সকল সামাজিক কার্যক্রম চালু আছে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে হামাস চালু করেছে 'আল আকসা' টিভি চ্যানেল।

হামাস সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক

সৌদির সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যেও কাজ করছে হামাস সরকার। হামাসের পলিট ব্যুরোর প্রধান খালিদ মিশাল সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সৌদির প্রতিও আহ্বান জানান। সৌদি টেলিভিশন আল-আরাবিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হামাসের এ নেতা সৌদি কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তিও দাবি করেন। মিশাল বলেন, 'আমরা স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে আরব দেশগুলোর সমর্থন চাই। এক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের ভূমি রক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সৌদি আরবের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করে হামাস।

সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ২০০৭ সালের ১৭ই মার্চ ফিলিস্তিনে ইসমাইল হানিয়ার নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হয়, যেখানে ফাতাহ্র প্রতিনিধিরাও যোগ দেয়। মাত্র ১০ দিন পরে অনুষ্ঠিত আরবলীগের সম্মেলনে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধিত্ব করেন ইসমাইল হানিয়া ও মাহমুদ আব্বাস। গাজার অধিকাংশ মানুষ বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত, এই উদ্বাস্তু মানুষগুলো স্বীয় ভিটেয় ফিরতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

হামাস নির্বাচনে জয়লাভের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে– তারা কোনোভাবেই হামাসকে স্বীকৃতি দেবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্যও একই। হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোপ্রধান খালিদ মিশালও জানিয়ে দেন যে, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে জানিয়ে দিতে চাই– যদি আপনারা চাপ দিয়ে আমাদের সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে দেবেন বা নীতিচ্যুত করবেন বলে ভেবে থাকেন, তাহলে আপনারা ভুলের মধ্যে আছেন।

মার্কিন সিনেটে কণ্ঠভোটে হামাস সরকারকে বিচ্ছিন্ন এবং তাদের সাথে সবধরনের যোগাযোগ নিষিদ্ধ বিল অনুমোদিত হয়। বর্তমান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট– তৎকালীন ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটের জো বাইডেন ছিলেন এই বিলের উগ্র সমর্থক। তিনি বলেছিলেন, আমরা কেউই চাই না– মার্কিন

Scanned by CamScanner

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কষ্টার্জিত উপার্জনের একটা টাকাও হামাস সরকারের কাছে যাক। কারণ, হামাস সরকার আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি।

খালিদ মিশালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তুরস্কে গমন করেছিলেন (২০০৬ খ্রি., ১৬ই ফেব্রুয়ারি) এবং তুরস্কের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। একই ব্যক্তির নেতৃত্বে হামাসের প্রতিনিধি দল ৩রা মার্চ ২০০৬ সালে রাশিয়ায় গমন করেন এবং মস্কোর স্থানীয় প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এ সময় হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর নেতারা ইরান, সিরিয়া, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়েমেন, সুদান, ওমান, আলজেরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। হামাসের নিকটতম প্রতিবেশী-দেশ জর্ডানের সাথে অতীত-তিক্ততা ভুলে হামাস ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। কেননা, হামাস সরকারের জন্য প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ জমা হচ্ছিল জর্ডানে।

হামাস সরকারের চ্যালেঞ্জ

হামাসের বিজয়ের প্রতি প্রথম চ্যালেঞ্জ ছোড়ে ফাতাহ্। কেননা, পূর্বে তারাই ছিল ফিলিস্তিনের হর্তাকর্তা। তবে ফাতাহ্র চাপকে হামাস আমলেই নেয়নি। আন্তর্জাতিক চাপ হামাসকে চাপে ফেলতে তৎপর হয়। আন্তর্জাতিক অবরোধ দিয়েও হামাস সরকারকে দুর্বল করা যাচ্ছিল না; বরং হামাসের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়ছিল। কেননা, এসবের জন্য সাধারণ মানুষ ইসরায়েল ও তাদের পশ্চিমা দোসরদের দায়ী করছিল।

ফিলিস্তিনিদের পাশে মুসলিম নেতৃবৃন্দ

যদিও মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ইসরায়েলকে (১৯৪৯ খ্রি.) স্বীকৃতি দিয়েছিল তুরস্ক, তবুও এরদোয়ানের একে পার্টি ক্ষমতায় আসার পর ইসরায়েলের গাজা অবরুদ্ধের প্রেক্ষিতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। গাজায় অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনিদের জন্য তুরস্কের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা আইএইচএইচের (IHH) নেতৃত্বে তুরস্কের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানবাধিকার কর্মী, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও সাংবাদিক নিয়ে ছয়টি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে অবরোধ ভাঙতে গাজার দিকে রওয়ানা হলে ইসরায়েল অবৈধভাবে হামলা করে বসে। এতে ১০ জন নিহত ও ৫৬ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। এই ঘটনার পর উভয় দেশের সম্পর্কের

Scanned by CamScanner

মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং তুরস্ক ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। দীর্ঘ ছয় বছর পর সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। কিন্তু, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল জেরুজালেমকে রাজধানী ঘোষণা করলে সম্পর্কের আবারও অবনতি ঘটে এবং এরদোয়ান ইসরায়েলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। এরদোয়ান বলেন (৫ই ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি.), 'মাননীয় ট্রাম্প, কুদস মুসলমানদের রেডলাইন। যখন ফিলিস্তিনি জনগণ আহত হচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত; সেখানে অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, জুলুম-অত্যাচার চলছে– এমন একটি ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত শুধু আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনই না, সেইসাথে মানবাধিকারের এক বড় লঙ্ঘন।'

একই সাথে এর আট দিন পর তিনি আহ্বান করেন ওআইসির বিশেষ সম্মেলন। এই সম্মেলনে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেন এবং জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করেন। সেই সাথে পূর্ব-জেরুজালেমে তুরস্কের দূতাবাস খোলার ঘোষণা দেন এবং মুসলিম দেশগুলোকেও দূতাবাস খোলার আহ্বান জানান। জাতিসংঘ আমেরিকার ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাসের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। যার অংশ হিসেবে স্থায়ী পরিষদের পনেরো দেশের মধ্যে শুধু আমেরিকা ছাড়া সবাই প্রস্তাব পাশের পক্ষে ভোট দেয়। ট্রাম্পের হুমকি উপেক্ষা করে সাধারণ পরিষদেরও ১২৮টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। আমেরিকাসহ মাত্র ৯টি দেশ প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল, যা ছিল জাতিসংঘে ফিলিস্তিনের একটি বড় অর্জন।

এরদোয়ান সরকার হামাস নেতৃবৃন্দকে সার্বিক সহায়তাও করে থাকেন। একে পার্টি হামাসকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সব সময় মর্যাদার আসন দিয়ে থাকে। দলের পক্ষ থেকে হামাস প্রধানদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। একে পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে আমন্ত্রিত অতিথি করে নিয়ে যান এবং বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি খালিদ মিশালের নেতৃত্বে হামাসের এক প্রতিনিধি দল তুরস্কের আঙ্কারায় গমন করেন এবং তুরস্কের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎও করেন।

দখলদার ইসরায়েলি রাষ্ট্রের বর্বরোচিত ভয়াবহ হামলার শিকার ফিলিস্তিনকে নিয়ে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সাথে আলাপ করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এই দুই শীর্ষনেতা দখলদার

Scanned by CamScanner

ইসরায়েলের ভয়াবহ আগ্রাসনের শিকার ফিলিস্তিনিদের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। মুসল্লিদের ওপর নৃশংস হামলা, পূর্ব-জেরুজালেম ও গাজায় আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের বর্বরোচিত বোমা হামলার তীব্র নিন্দা করে ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় বিশ্বসম্প্রদায়কে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এই দুই নেতা। পাকিস্তানি নেতা ইমরান খান বলেন, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের ব্যাপারে পাকিস্তানের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং আমরা কখনোই ইসরায়েল সরকারকে স্বীকৃতি দেব না।

ইসরায়েলি টহল সেনা দলের গাড়িতে রকেট হামলার প্রেক্ষিতে ১১ই নভেম্বর ২০১২ খ্রি. গাজায় গোলা বর্ষণ শুরু করে ইসরায়েলি সেনারা। এতে ৪ জন বেসামরিক লোকসহ মোট ৬ জন নিহত হয় এবং ৩২ জন আহত হয়। এই পরিস্থিতিতে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইহুদ বারাক এবং চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল বেনি গ্যানৎস জরুরি বৈঠকে মিলিত হয় এবং বৈঠক শেষে ঘোষণা দেয়, 'বিশ্বের জানা দরকার যে, হামলার শিকার হলে ইসরায়েল বুকে হাতবেঁধে বসে থাকবে না। আমরা হামলার কঠোরতর জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছি।'

ইসরায়েলি হামলায় হামাসের সামরিক শাখার প্রধান আহমেদ জাবারীসহ শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহৃত হয়, যার মধ্যে ২৭ জন শিশুসহ অধিকাংশই ছিল সাধারণ নাগরিক। মুরসি টেলিভিশন ভাষণে বলেন, 'ইসরায়েলের আগ্রাসন রোধ করার সংগ্রামে মিশর গাজার অধিবাসীদের সাথে থাকবে।' ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান ক্যাথারিন অ্যাশ্টন, জার্মান প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, চীনা প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সকলেই যুদ্ধ বিরতির জন্য তৎপরতা শুরু করেন।

গাজা যুদ্ধের শুরুতেই মুরসি ইসরায়েল থেকে মিশরের রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেন। গাজার বিভিন্ন জায়গায় বিমান হামলা শুরু করলে মুরসি এ সিদ্ধান্ত নেন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ইসরায়েলের বুঝতে হবে, এ ধরনের আগ্রাসন মেনে নেওয়া হবে না।' তিনি প্রধানমন্ত্রী হিশাম কান্দিলকে সঙ্গতি প্রকাশের লক্ষ্যে গাজা সফরে পাঠান। একই সঙ্গে ইসরায়েলের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য হামাসের ওপরও প্রভাব রাখেন। অথচ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল ইখওয়ানের ক্ষমতারোহণে উদ্বিগ্ন ছিল। মিশরের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হোদা সালেহ বলেন, 'বিরোধী দলে থাকাকালে ইসরায়েল এবং মিশরের বিদেশনীতির সমালোচনা

Scanned by CamScanner

করা মুরসির পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু এখন তিনি প্রেসিডেন্ট এবং জানেন যে, ইসরায়েলকে শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করাটা তার সামর্থ্যে কুলাবে না।'

গাজা সংকটের আপাত নিরসনের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এবং ইসরায়েলের কট্টরপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিগডোর লিবারমান যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য মুরসিকে ধন্যবাদ জানায়। প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একাগ্রতা এবং ধারবাহিকতা বজায় রাখেন। উল্লেখ্য যে, অনেক প্রচেষ্টার পর হামাস ও ইসরায়েলি প্রশাসনের মধ্যে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিশর এতে মধ্যস্থতা করে। মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ কামেল আমর ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন, যা কার্যকর হয় বুধবার স্থানীয় সময় রাত নয়টা থেকে (২২শে নভেম্বর, ২০১২ খ্রি.)।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর গাজার বাসিন্দাদের উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যায় এবং ইসরায়েলের কিছুকিছু নাগরিককে হতাশ হতে দেখা যায়। হামাস নেতা খালেদ মিশাল বলেন, 'ইসরায়েল যদি যুদ্ধবিরতি মেনে চলে, তাহলে তারাও সেটা মেনে চলবে।' জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে তিনি পরিস্থিতিকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দিতে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন।' উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসি যুদ্ধবিরতি কার্যকরের দিকে নজর রাখার জন্য পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনে যোগদান থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় দশ

মোসাদের হামাস নেতৃবৃন্দ হত্যার মিশন

রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রার ১৯ মাসের মাথায় ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়ান ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ[৪৭] প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর দ্য সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর করডিনেশন নামে মোসাদের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চে। দ্য সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর করডিনেশন-এর ডিরেক্টর রিউভেম শিলোয়াহ (১৯৫১, ১লা এপ্রিল-১৯৫২, ২২শে সেপ্টেম্বর) ছিলেন এর প্রথম পরিচালক। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোসাদ দুর্দান্ত আকারে পিএলও নেতা খলিল ওয়াজির, সালাহ খালাফ, ফাখরি আল উমরি, হায়েল আব্দুল হামিদকে হত্যা করে। পিএলও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায় মোসাদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়।

পরবর্তীতে হামাসের উত্থান ও কর্মকাণ্ডে বিচলিত হয়ে মোসাদ হামাস নেতৃবৃন্দকে হত্যার মিশনে নামে। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি হামাস নেতা ইয়াহিয়া আয়াশ[৪৮]কে হত্যা করে ইসরায়েল। ইসরায়েল ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর এক গুপ্ত হামলা চালিয়ে সামরিক শাখার অন্যতম

---

[৪৭]ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের জন্ম ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে হলেও ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কেউই জানতো না এই সংস্থাটির প্রধানের কথা।

[৪৮]ইয়াহিয়া আব্দুল লতিফ আয়াশ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ পশ্চিম-তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পড়াশোনা শেষে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয়ে (Birzeit University) ভর্তি হন। তিনি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বোমা বানাতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ইসরায়েলি বাহিনী তাকে (৫ই জানুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রি.) হত্যা করে। তার হত্যার প্রতিশোধ কল্পে চারবার আত্মঘাতি হামলা চালিয়ে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ৯৬-এর মধ্যে ৭৮ জন ইসরায়েলিকে হত্যা করে হামাস।

Scanned by CamScanner

শীর্ষ নেতা আবু হালুদ এবং তার দুই সহযোগীকে হত্যা করে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জুলাই ইসরায়েল হামাসের শীর্ষনেতা সালাহ শিহাদাকে হত্যা করে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ২১শে আগস্ট আরেক শীর্ষনেতা ইসমাইল আবু শানাবকে হত্যা করে। এই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে শেখ আহমাদ ইয়াসিনকে হত্যার জন্য ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে। এ সময় হামাসের প্রতিষ্ঠাতার সাথে ইসমাইল হানিয়াও ছিলেন। তারা প্রাণে বেঁচে গেলেও ১৫ ফিলিস্তিনি আহত হন সেই হামলায়। হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং গাজার শীর্ষ হামাস নেতা ও হানিয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মাহমুদ আল জাহহারকেও[৪৯] হত্যার জন্য আক্রমণ করেছিল। ড. জাহহারের স্ত্রী ও কন্যা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পঙ্গু হয়ে যান এবং তার বড় ছেলে নিহত হন।

শীর্ষ-স্থানীয় হামাস নেতা জীবন্ত শহীদ খালিদ মিশালকে হত্যার এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা-ফাঁদ পেতেছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান খালিদ মিশাল তখন আম্মানে থাকতেন। আম্মানে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী খালিদ মিশালকে একপ্রকার বিষ প্রয়োগ করে হত্যার প্রচেষ্টা চালায় মোসাদ। জর্ডানের বাদশাহ হোসেন এ ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ ক্যান্সারের চিকিৎসক দলকে আমেরিকার আয়ো ক্লিনিক থেকে জর্ডানে নিয়ে আসেন খালিদ মিশালের চিকিৎসার জন্য। প্রেসিডেন্ট হোসেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

---

[৪৯] হামাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ড. মাহ্মুদ আল জাহহার ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ফিলিস্তিনি হলেও তার মা একজন মিশরীয়। তিনি ২৬ বছর বয়সে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিনের ওপর গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন এবং পাঁচ বছর পর কায়রোর আইন শামস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল সার্জারির ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি গাজার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেবাননে নির্বাসিত হন এবং এক বছর পর গাজায় ফিরে আসেন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তার বাড়ির ওপর এফ-১৬ বিমান থেকে বিশাল বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই আক্রমণে তার জ্যেষ্ঠপুত্র খালিদ এবং একজন বডিগার্ড নিহত হন। তার কন্যা রিমাসহ ২০ জন আহত হয়। আব্দুর রহমান মসজিদসহ বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিনি আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রথম হানিয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (২০শে মার্চ, ২০০৬-১৮ই মার্চ, ২০০৭ খ্রি.) দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তার অপর পুত্র হুশাম (কাসসাম ব্রিগেড সদস্য) ইসরায়েলি আক্রমণে অনেক হামাস সদস্যের সাথে শহীদ হন। তার চার সন্তানের মধ্যে তিন জনই ইসরায়েলি আক্রমণে শহীদ ও আহত হন।

Scanned by CamScanner

বিল ক্লিনটনকে ফোন করে সবিস্তারে এ কাহিনী জানান এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। আসলে মোসাদ হামাসকে সতর্কতামূলক বার্তা প্রেরণ করতেই এমন করেছিল। প্রয়োগকৃত বিষ এতই মারাত্মক ছিল যে, মিশাল ঘুমিয়ে পড়লেই তার ফুসফুস অকার্যকর হয়ে যেত এবং তিনি মারা যেতেন। এ ঘটনার পাঁচ দিন পর বাদশাহ হোসেন (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি.) জর্ডানের জারকা এলাকায় এক ভাষণে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিতে এবং অবিলম্বে শেখ আহ্মাদ ইয়াসিন এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি দাবি করেন। অন্যথায় ইসরায়েলকে চরম মূল্যের হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। বাদশাহ হোসেনের মতো 'মিত্রে'র আকস্মিক ক্রুদ্ধ মনোভাব ও কঠোর পদক্ষেপের কারণে আমেরিকাও ভড়কে যায়। ইসরায়েল পড়ে যায় বেকায়দায়। ইসরায়েল বাধ্য হয় বিষের অ্যান্টিডোজ দিতে। অ্যান্টিডোজ প্রয়োগের পর খালিদ মিশাল দীর্ঘ কয়েক মাস পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে রাজনৈতিক ময়দানে ফিরে আসেন। এই ঘটনার পর ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগার থেকে ফিলিস্তিনের ৪০ জন বন্দিও মুক্তি পেয়েছিল। এই ঘটনায় মোসাদের প্রধান ড্যানি ইয়াটম পদত্যাগ করেছিল।

মোসাদ কেন খালিদ মিশালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল?

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুলাই জেরুজালেম বোমা হামলায় কেঁপে ওঠে এবং ১৬ জন ইসরায়েলি সৈন্য নিহত ও ১৬৯ জন সৈন্য আহত হয়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মোসাদ প্রধান এবং তার এক সময়ের সামরিক সচিব ড্যানি ইয়াতোমকে নিয়ে তেল আবিবের মোসাদ সদর দফতরে এক জরুরি মিটিং-এ মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, কোন হামাস নেতাকে এখনই হত্যা করা ইসরায়েলের জন্য অধিক মঙ্গলজনক হবে। সেই সময় হামাসের সবচেয়ে চৌকশ নেতা ছিলেন মূসা মোহাম্মদ আবু মারজুক। গোয়েন্দা প্রধান মূসা মোহাম্মদ আবু মারজুককে হত্যার পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু আমেরিকান পাসপোর্টধারী মারজুককে হত্যা করলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, তাই পরবর্তী টার্গেট নির্ধারণ করে আম্মানে অবস্থানরত খালিদ মিশালকে। কেননা, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার খালিদ মিশালই হতে যাচ্ছেন হামাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান নক্ষত্র।

Scanned by CamScanner

মোসাদের নিজস্ব ল্যাবে উদ্ভাবিত বিষ প্রয়োগ করে হত্যার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতঃপূর্বে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের নেতা হাদাদকে এই বিষ প্রয়োগ করে সফলভাবে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিল। মোসাদের আটজন গোয়েন্দা আম্মানে পৌছায় এবং পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে হত্যা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে এবং মিশালের দেহে তারা বিষ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। মিশাল ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

মোসাদ তাদের স্বার্থের জন্য বিভিন্ন আরবদেশের উদীয়মান বিজ্ঞানীদের হত্যা করেছে; বিশেষ করে তেহরানে পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞানীদের লাশের পাহাড় বানিয়ে দিয়েছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ১৮ ইরানি টেকনিশিয়ান হত্যায় সম্পৃক্ত ছিল মোসাদ। ইরানের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আলী রেজা আসগারীকে গুম করে। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯ বছর বয়সী বিজ্ঞানী মোহসীন ফখরী হারিয়ে গেছে। খোঁজ নেই পরমাণু বিজ্ঞানী শাহরাম আমিরীরও। বিদ্রোহীদের উত্থান, সংখ্যালঘুদের উস্কে দেওয়া, প্লেন দুর্ঘটনা, ল্যাবরেটরি পুড়ে যাওয়া, পারমাণবিক কেন্দ্র ও ক্ষেপণাস্ত্রে বিস্ফোরণ, ইরানি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের দেশ ও স্বপক্ষ ত্যাগ, সিনিয়র বিজ্ঞানীদের হত্যা; মোসাদ এক ধ্বংসলীলায় মেতে আছে আজন্ম। হত্যাযজ্ঞ আর নিষ্ঠুরতা মোসাদের যেন অপর নাম। মোসাদ তার পরিকল্পনায় সফল হতে সুন্দরী ইহুদি নারীদেরও ব্যবহার করেছে অবলীলায়।

মোসাদ হত্যা করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী হামাস নেতা মাহ্মুদ রউফ আল-মাবুহকে। ইরান থেকে গাজায় অস্ত্র আনা-নেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি এবং তিনিই তা নিয়ন্ত্রণ করতেন। অস্ত্রের পুরো ব্যাপারটাই ডিল করত মাবুহ। এটা ওয়াকিবহাল হওয়ার পর ঘুম হারাম হয়ে যায় মোসাদ প্রধান মেয়ার দাগান আর ইসরায়লি প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর। তাদের টার্গেটই হলো– এ অঞ্চলে ইরানকে মাথা চালাতে দেওয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত হয় মাবুহকে হত্যা করতে হবে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী হত্যার অনুমোদন দিয়ে দেয়। উত্তর জাফার জাগানিয়া শরণার্থী ক্যাম্পে জন্ম নেওয়া ধর্মপ্রাণ এই মুসলিম যুবক কাসসাম ব্রিগেডেরও একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার একক অপারেশন চালিয়ে ধ্বংস করেছিলেন জুয়া খেলার ক্যাফে, খতম করেছিলেন কয়েকজন দখলদার ইসরায়েলি সৈন্য। সর্বশেষ তার দায়িত্বই ছিল গাজায় স্বাধীনতাকামীদের অস্ত্র ও বিস্ফোরক পৌছে দেওয়া।

Scanned by CamScanner

মিশরীয় সরকার একবার তাকে গ্রেফতার করে জেলেও রেখেছিল। সেখান থেকে পালিয়ে যান সিরিয়ায়। মোসাদের খপ্পর থেকে বাঁচতে তিনি অবলম্বন করতেন সর্বোচ্চ সতর্কতা। তারপরও তিনি কমপক্ষে তিনবার হামলার শিকার হয়েছিলেন। সর্বশেষ তাকে দুবাইয়ের বিখ্যাত হোটেলে রাত ৮টা ২০ মিনিটে হত্যা করে চার আততায়ী হোটেল ত্যাগ করে। মধ্যরাতে হোটেল কর্তৃপক্ষ তার রুমে তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। হামাস নেতা আহ্‌মদ রউফ আল মাবুহ-এর দেহে মোসাদের ঘাতকেরা ইনজেকশনের মাধ্যমে এ্যানেসথেসিয়া বিষ প্রয়োগ করে। জার্মান সাপ্তাহিকীর মতে, মোসাদই আল মাবুহের হত্যাকারী। সম্ভবত ২৭ জন খুনি এতে অংশগ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় ষোলো

গাজা : মানবতাহীন বিশ্বের এক উন্মুক্ত গুয়ান্তানামো বে কারাগার

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র এখনও কল্পনার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কেননা, একটি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আছে বটে কিন্তু এর কোনো সার্বভৌমত্ব নেই। উপরন্তু পশ্চিম-তীর আর গাজা নিয়ে যে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জন্ম, তা কার্যত অনেকটাই ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েল এমনই একটি রাষ্ট্র চায়, যা সর্বদা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হবে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে আগ্রাসান চালিয়ে ইসরায়েলি বিমান আর ট্যাংক গাজাকে পরিণত করেছিল একটি ধ্বংসের নগরীতে। ইসরায়েলি বিমান হামলাতে শুধু মারাই গিয়েছিল শতশত শিশু। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায়ের কেউ কিছু বলেনি। এটা সত্য যে, ফিলিস্তিন ভূ-খণ্ডটা ফিলিস্তিনিদের। অথচ ইসরায়েলিদের কী পরিকল্পনা! একজন কট্টর ইহুদি স্ট্র্যাটেজিস্ট ওডেড ইনন (Odd Einon) তার গ্রেটার ইসরায়েল রাষ্ট্রটির পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে এভাবে, বৃহত্তর ইসরায়েলি রাষ্ট্রটি হবে পুরো ফিলিস্তিন এলাকা, দক্ষিণ লেবানন থেকে সিডন (Sidon) এবং লিটানি নদী পর্যন্ত (Litani River) সিরিয়ার গোলান উপত্যকা, হাওরান (Hawran) ও দেরা (Deraa) উপত্যকা, হিজাজ (Hijaz), রেলপথ দেরা থেকে আম্মান পর্যন্ত। কেউ কেউ তো বলেছেন, 'পশ্চিমে নীলনদ থেকে পূর্বে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ, যার মধ্যে থাকবে ফিলিস্তিন, লেবানন, পশ্চিম সিরিয়া ও দক্ষিণ তুরস্ক।' ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে সুন্দর করে সাজিয়েছে তাদের প্রশাসন ব্যবস্থা।

Scanned by CamScanner

আধুনিক ইসরায়েলের প্রধান প্রশাসনিক একক

ক্র: নং	জেলা	জনসংখ্যা	প্রধান শহর
০১	উত্তর	১২,৪২,১০০	নাজারেথ
০২	হাইফা	৮,৮০,০০০	হাইফা
০৩	কেন্দ্রীয়	১৭,৭০,২০০	বামানা
০৪	তেল আবিব	১২,২৭,০০০	তেল আবিব
০৫	জেরুজালেম	৯,১০,০০০	জেরুজালেম
০৬	দক্ষিণ	১০,৫৩,৬০০	বিরসেরা
০৭	জুদিয়া ও সামরিয়া (পশ্চিম-তীর)	৩,৭৫,০০০	আরিয়েল

অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইহুদিরা বিশ্বের অতি নগণ্য একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। ইসরায়েলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিনও এ অঞ্চলের জনসংখ্যার মাত্র ১%-এরও কম ছিল এই সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বর্তমানে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, সমর-শক্তিতে ইহুদিদের অর্জন প্রশ্নাতীত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার মাত্র ১.৭% ইহুদি, অথচ দেশটির অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক, বৃহত্তম আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা, পরিচালনা, ডিজনি কোম্পানি, টাইম ও ওয়ার্নার কর্পোরেশন, নিউজ কর্পোরেশন, সনি কর্পোরেশন অব আমেরিকা সবকিছু ইহুদিদের দখলে।

সামরিক শক্তি হিসেবে ইসরায়েল নিজেকে নিয়ে গেছে অসামান্য উচ্চতায়। প্রযুক্তিগত দক্ষতা, অর্থসম্পদ এবং সামরিক শক্তি গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারে এই রাষ্ট্রটি বিশ্বে ১৬তম স্থান করে নিয়েছে। মোট জনসংখ্যা তিরাশি লক্ষের মতো, যার মধ্যে কর্মক্ষম হলো ৩৬ লাখ। সক্রিয় ১ লাখ ৭০ হাজারসহ মোট সৈন্য সংখ্যা ৬ লাখেরও উপরে। রিজার্ভ রয়েছে আরও সাড়ে চার লাখ সৈন্য। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার জন্য এমন কোনো পদ্ধতি নেই, যা তারা গ্রহণ করেনি। অথচ গাজার অধিবাসীরা যেন মানুষই না।

Scanned by CamScanner

দাম্ভিক এ্যারিয়েল শ্যারনের মন্তব্য ছিল এমন, 'ইসরায়েল একটি ইহুদিরাষ্ট্র। এখানে ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের প্রশ্নই ওঠে না।' প্যালেস্টাইনি নেতৃবৃন্দের প্রতি তার নসিহত এমন, 'বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া হবে মঙ্গলজনক।' বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনিদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে ইসরায়েল সামান্যতমও দ্বিধা করে না। যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে না।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে– গাজা উপত্যকা, যা বর্তমানে ফিলিস্তিনের বৃহত্তম শহরে পরিণত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এই স্বশাসিত অঞ্চলটির অধীনে রয়েছে চারটি শহর, আটটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির আর ১১টি গ্রাম। ৩৬০ বর্গকিলোমিটারের এই জায়গাটাতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০৪৬ জন লোক বাস করে। এর পশ্চিমে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিশর এবং উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বের পুরো অঞ্চল জুড়ে ইসরায়েল। হামাস নিয়ন্ত্রিত এই অঞ্চলটির স্বাধীনতা পুরোপুরি স্বীকৃত নয়। এর পূর্বসীমান্ত ইসরায়েলের দখলে এবং সিনাই মরুভূমির দক্ষিণ-সীমান্ত মিশরের দখলে রয়েছে। অঞ্চলটি কড়া প্রহরাধীন এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা। ছোট এই এলাকাটুকুতে বাস করে ১৯ লাখ ফিলিস্তিনি। এদের অধিকাংশই বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া শরণার্থী ফিলিস্তিনিদের বংশধর। তাই অবরুদ্ধ জনপদটির অধিবাসীরা স্বপ্ন দেখে– নিজেদের হারিয়ে যাওয়া জনপদ ফিরে পাবার। এখানকার মানুষদের দারিদ্র্যতা আর বেকারত্ব নিত্যসঙ্গী। আবার কঠোর চেকপোস্ট অতিক্রম করে বাইরে যাবারও সুযোগ নেই। পূর্বে চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক সংকটে মিশরে বা ইসরায়েলে যাবার সুযোগ ছিল। এখন সেটাও সীমিত হয়ে পড়েছে। এমনকি ডায়ালাইসিস মেশিনের মতো যন্ত্রপাতি গাজাতে নিয়ে আসাও সমস্যা হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলোতেও বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক মতো পৌছাতে পারে না। খাদ্য সংকটের পাশাপাশি এখানকার জনসাধারণের রয়েছে তীব্র আবাসন সংকট। করতে পারে না নিজেদের ইচ্ছামতো চাষবাস কিংবা মৎস্য আহরণ। সীমার কাছাকাছি পৌছালেই মাছ ধরার ট্রলারগুলোতে গুলি চালিয়ে দেয় ইসরায়েলি সৈন্যরা। বিদ্যুৎবিভ্রাট নিত্যসঙ্গী, সারাদিনে মাত্র ঘন্টা দুয়েক থাকে বিদ্যুৎ। স্বল্প পরিমাণে রয়েছে ডিজেল চালিত ব্যয় বহুল জেনারেটর। পানযোগ্য পানির রয়েছে তীব্রসংকট। বাড়িগুলোতে রয়েছে

Scanned by CamScanner

পানি সরবরাহের অনিয়মিত ব্যবস্থা। ৯৭% বাড়িকেই নির্ভর করতে হয় ট্যাংকার দিয়ে সরবরাহ করা পানির ওপর। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত। ফলে ৯৫% খোলা পানিই দূষিত।

গাজা ও ফিলিস্তিনের অন্য এলাকার মধ্যে লোকজন ও পণ্যের চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত আছে। মিশর ও গাজার দক্ষিণ সীমান্তে অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। পূর্বে মিশর ও গাজার মধ্যে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের সুরঙ্গ গড়ে তোলা হয়েছিল, যা দিয়ে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্য মিশর থেকে গাজায় ঢুকত। এখন সেগুলোও বন্ধ। গাজা সীমান্তে রয়েছে ইসরায়েলের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। বাইরে যাওয়া-আসা কিংবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আনা-নেওয়া নির্ভর করে ইসরায়েলের দয়ার ওপর। কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাইরে পাঠাতে কিংবা প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ গাজায় আনতে প্রয়োজন পড়ে ইসরায়েলের অনুমোদনের। শুধু তাই নয়, সকল ধরনের ওষুধ, শিক্ষা উপকরণ, জ্বালানি তেল এবং অন্যান্য রসদসামগ্রী আমদানিতে রয়েছে ইসরায়েলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।

কমে আসছে অবরুদ্ধ গাজাবাসীর গড় আয়ও। আর যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৬০%-এরও বেশি। দারিদ্র্যের হার ৩৯% যা পশ্চিম-তীরের ফিলিস্তিনিদের তুলনায়ও দ্বিগুণ। এই জনপদের মানুষ এখন বেঁচে থাকার জন্য কল্যাণ ভাতার দিকে চেয়ে থাকে।

উপরন্তু প্রতিনিয়ত রয়েছে গাজাবাসীর ওপর দখলদার ইসরায়েলের সশস্ত্র আক্রমণ। ২০০৬ সালের নির্বাচনের পর হামাস কর্তৃক গাজার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণে ফাতাহ্-হামাসের সংঘাতভূমিতে পরিণত হয় গাজা। গাজাবাসী যেন নিপীড়নে অন্য আরেক মাত্রায় পৌঁছে যায়।

বিশ্ব নেতৃত্ব হামাসকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে গাজার জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ২০০৭ সালে পশ্চিমা মদদপুষ্ট মাহমুদ আব্বাস নির্বাচিত ইসমাইল হানিয়াকে পদচ্যুত করলে হানিয়া তাতে অস্বীকৃতি জানান। এর প্রেক্ষিতে ইসরায়েল গাজাকে সর্বাত্মক অবরোধ করে রাখে। অবরোধ চালিয়ে হামাসকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে গাজায় অভিযান চালায় ইসরায়েল। এমনকি মাহমুদ আব্বাসকে দিয়ে গাজাবাসীকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করে ইসরায়েলি প্রশাসন। অভিযান চালিয়েছিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকেও। তবুও গাজাবাসী ইসরায়েলের প্রত্যক্ষ শান্তি আলোচনা প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

Scanned by CamScanner

২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ইসরায়েল গাজার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। গাজাবাসীর রকেট হামলা রুখতে ইসরায়েল সাড়াশি অভিযান শুরু করে। এতে গাজাবাসী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিল। চার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংসসহ ২ বিলিয়ন সম্পদের ক্ষতি করেছিল ইসরায়েল। ২২ দিন ধরে চলা এই অভিযানে ১,৪০০ ফিলিস্তিনি নিহত হন এবং দেশটির বেশি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

গাজা ইসরায়েলের আগ্রাসী আক্রমণের শিকার হয়েছিল ২০১২ খ্রিস্টাব্দেও। নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠন হামাসের ফিলিস্তিনি কমান্ডার আহমেদ জাবারিকে গুপ্ত হত্যার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইসরায়েল গাজায় অভিযান চালিয়ে ১০০ জনেরও বেশি বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছিল। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মধ্যরাতে গাজা ভূ-খণ্ডে আছড়ে পড়ে ইসরায়েলি তাণ্ডব। এক ইসরায়েলি কিশোরকে হত্যায় হামাসকে অভিযুক্ত করে গাজায় আক্রমণ চালালে ২,১৪৩ জন ফিলিস্তিনি মারা যায়। আহত হয় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ। এসব ব্যক্তিবর্গের তিন-চতুর্থাংশই হচ্ছে বেসামরিক নাগরিক।

গাজাবাসীর রক্তাক্ত ইতিহাসে ১৪ই মে ২০১৮ ছিল আরেকটি বিষাদময় দিন। সেদিন গাজা পরিণত হয়েছিল এক রক্তাক্ত প্রান্তরে। আক্রমণের প্রথম দিনেই নিহত হয়েছিল ৫৮ জন নিরিহ গাজাবাসী আর আহত হয়েছিল তিন হাজারেরও বেশি মানুষ।

কোনো কারণ ছাড়াই (২০২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে) ইসরেয়েলি বাহিনী হামলা চালায় নিরীহ গাজা ও পশ্চিম-তীরের বাসিন্দাদের ওপর। টানা ১১ দিনের সংঘাতের পর হামাস ও ইসরায়েল যুদ্ধরিতিতে স্বাক্ষর করে। পুরো গাজা উপত্যকা ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। বোমা হামলায় প্রাণ হারায় নারী-শিশুসহ আড়াই শতাধিক ফিলিস্তিনি। ইসরায়েল গুঁড়িয়ে দেয় এপি এবং আল জাজিরার কার্যালয়ও। গাজার হামাসপ্রধান ইয়াহইয়া সিনওয়ারের বাড়িও মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

Scanned by CamScanner

গাজার ঘরে ঘরে খানসা আর ফাদি আবু সালাহ

মহিলা কবি খানসা (রা)-এর চার ছেলে কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং চার জনই এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে চার ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা, যিনি তাদের শাহাদতের মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করেছেন।'

ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিটি গৃহ যেন খানসা (রা)-এ ভরে গেছে। প্রতিটি পরিবারেই এক থেকে একাধিক শহীদ। এতিম-অসহায় সন্তানে ভরে গেছে গাজার প্রতিটি গৃহ। 'আব্বুগো', 'আব্বুগো' বলে কফিনের পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকা পিতাহারা অসহায় বালকের আকুতি বুককে বিদীর্ণ করে প্রতিনিয়ত। সম্ভবত গাজার মতো বিশ্বের আর কোথাও এক সাথে এত পঙ্গু মানুষের, এত এতিম শিশু সন্তানের বসতি নেই। গাজার প্রতিটি মানুষই যেন ইসরায়েলি বিমান, ট্যাংক আর মর্টারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন; পঙ্গুত্বকে সঙ্গী করে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে গাজায় ইসরায়েলের সর্বাত্মক হামলায় দুই পা হারিয়েছিলেন ইয়াসের সোকার। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বিক্ষোভ করার দায়ে দুপা হারা ইয়াসের সোকারকে হত্যা করে ইসরায়েলি বাহিনী। আহত হয় আরো শতাধিক ফিলিস্তিনি। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসের সোকার যেদিন দুপা হারিয়েছিলেন, সেদিনও কয়েক হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছিল ইসরায়েল। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করে ইসরায়েল। তাদের নির্বিচারে গুলিতে মারা যান ৬০ জন গাজাবাসী। নিহতদের মধ্যে আট মাসের শিশু লায়লা ও দুই পা হারানো কাদি আবু সালাহর মতো মানুষও ছিলেন।

Scanned by CamScanner

শেষ অধ্যায়

অপেক্ষা : কোথায় শেষ হবে এই অন্তহীন সংঘাত

বিশ্বমানবতার কসাই ইসরায়েলি দখলদারিত্বের যথার্থ প্রতিমূর্তি, দীর্ঘ একযুগের মূর্তিমান আতঙ্ক বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পতনের পর দখলদার এই রাষ্ট্রটির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছে নাফতালি বেনেট। প্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ী সাবেক কমান্ডার এই নাফতালি একজন উগ্র ডানপন্থী এবং অধিক কট্টরপন্থী। সে ইহুদিদের সংস্কৃতি মেনে চলে। নেতানিয়াহুর চীফ অফ স্টাফের (২০০৬-২০০৮ খ্রি.) দায়িত্বপালনকারী এই ইহুদি নেতা লিকুদ পার্টি ত্যাগ করে ধর্মীয় কট্টরপন্থী দল জিউসম পার্টিতে যোগ দেয়। অধিক কট্টরপন্থী এই নেতা মনে করে– গোলান মালভূমিসহ ফিলিস্তিনের সব ভূ-খণ্ডের মালিক তারা। দুই রাষ্ট্রের সমাধান মানে না সে। সে হামাস নেতৃবৃন্দের মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাশী এবং তাদের সাথে যে-কোনো ধরনের চুক্তি-বিরোধী। তার দল ইয়ামেনা হামাসের সাথে অস্ত্রবিরতি চুক্তিরও বিরোধী। নেতানিয়াহু এবং বিরোধী দল–উভয়েই তাকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করে। ক্ষমতা গ্রহণ করেই শুরু করেছে আক্রমণ। অবৈধ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে এবং অবৈধ বসতি স্থাপনের প্রতিবাদে ফিলিস্তিনের পশ্চিম-তীরে চলমান বিক্ষোভে আক্রমণ করে বসে ইসরায়েলি বর্বর বাহিনী (জুলাই, ২০২১ খ্রি.)। এতে ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারী আহত হন। এমনকি অ্যাম্বুলেন্সেও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়েছে।

তাহলে কি মুক্তিকামী ফিলিস্তিনি কিংবা অবরুদ্ধ গাজাবাসীর জন্য কোনোই সুসংবাদ নেই? এমনিভাবেই তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে? মনে হয় না তা। সম্প্রতি গাজা যুদ্ধে (জুলাই, ২০২১ খ্রি.) হামাস চার হাজার রকেট নিক্ষেপ করেছে ইসরায়েল নিয়ন্ত্রিত ভূ-খণ্ডে। ইসরায়েলের সব জায়গায় আঘাত

Scanned by CamScanner

হানতে সক্ষম (২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত) হামাসের এইসব রকেট। এটি ইসরায়েলের আয়রন ডোম সিস্টেমকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। এতে পুরো ইসরায়েলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন ইসরায়েলি মারাও যায়। রকেট হামলার সময় মুহুর্মুহু সাইরেনের বিকট শব্দ ইহুদিদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। প্রাণ বাঁচাতে ইসরায়েলিরা ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে– হামাসের যোদ্ধারা এখন পূর্বের চেয়ে প্রশিক্ষিত এবং হিজবুল্লাহর মতো লড়াই করতে পারছে। জুলাই মাসের এই লড়াইয়ে ইসরায়েলি হিসেব মতে– ২৯ জন ইহুদির প্রাণহানী ঘটেছে, যার ২৭ জনই হচ্ছে সৈন্য।

সাম্প্রতিক সময়ের এই অভিযানে ইসরায়েল ১৬০টি যুদ্ধবিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শুরুর প্রথম ৪০ মিনিটে ৮০ টন বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলেছে। হামাসের টানেল নেটওয়ার্ক ধ্বংসের নামে দুই শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ৫০ জনই শিশু। আহত হয় প্রায় ৯৫০ জন ফিলিস্তিনি। গাজায় অবস্থানরত বিবিসির একজন সাংবাদিক বলেছেন, বহু ইসরায়েলি হামলার প্রত্যক্ষদর্শী তিনি; কিন্তু এমন ভয়াবহ হামলা আগে দেখেননি। গড়ে প্রতিদিন একশ থেকে দেড়শবার গাজায় বোমা ফেলেছে ইসরায়েল। সেই সাথে সীমান্ত থেকে নিক্ষেপ করেছে দূরপাল্লার কামানের গোলা। ইসরায়েল দাবি করছে– তারা গাজায় হামাসের শীর্ষ নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যা করেছে। তারা বলছে, এ অভিযানে বেশ কয়েকজন হামাস নেতাকে হত্যা করেছে।

শুধু হামাস নয়; হামাসের যে-কোনো নেতাকে যমের মতো ভয় পায় ইসরায়েল। এমন একজন নেতা হলেন মোহাম্মদ দেইফ। হামাসের সামরিক শাখার নেতা এই মোহাম্মদ দেইফ ইসরায়েলের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এবং তাকে হত্যা করতে কমপক্ষে ৯ বার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছে ইসরায়েল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে গাজার খান ইউনিস শিবিরে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ দেইফ-এর সাথে বোমার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে খ্যাত হামাসের কট্টরপন্থী নেতা ইয়াহিয়া আয়াশের (১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলি হত্যাকাণ্ডের শিকার) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে হামাসের সামরিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা সালাহউদ্দিন শেহাদাহকে হত্যার পর নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন মোহাম্মদ দেইফ। 'কাসসাম রকেট' তৈরির কৃতিত্ব দেওয়া হয় জীবনের অধিকাংশ সময় টানেলে অতিবাহিত করা দেইফকে। ইসরায়েলি হামলায়

Scanned by CamScanner

তার স্ত্রী ও তাদের শিশুপুত্র আলী নিহত হয়। হামাসের মুখপাত্র কৌজি বারহুম বলেছেন, 'পশ্চিম-তীর, গাজা কিংবা যে-কোনো স্থানে সংঘাতের ঘটনায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের একক আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনিরাও এখন দাঁতভাঙা জবাব দিচ্ছে তেল আবিবকে।'

উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক অভিযানের শুরুর দিকে অর্থাৎ রমজান মাসের শেষের দিকে ইসরায়েলি সৈন্যরা বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিলিস্তিনিদের ওপর ব্যাপক দমন অভিযান শুরু করে। এর প্রতিবাদে তেল আবিবকে চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেয় হামাস। তেল আবিব এতে কর্ণপাত না করলে শুরু হয় হামাসের রকেট হামলা।

রকেট প্রযুক্তি ইরানের কাছ থেকে পাওয়া বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা হামাসের জন্য। সামরিক বিশ্লেষকদের মতে হামাসের পরবর্তী লক্ষ্য– হিজবুল্লাহ্‌র মতো গাইডেড মিসাইলসহ বিপুল বিধ্বংসী ক্ষমতার অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা। এতে হামাস সমর্থ হলে ইসরায়েলের জন্য সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা সংকট বলে বিবেচিত হবে। তাতে থামতে পারে আগ্রাসী জায়নবাদী ইসরায়েলের সন্ত্রাস আর দখলদারিত্ব। বিশ্লেষকদের মতে, মিলিশিয়া বাহিনীর মাধ্যমে প্রক্সি যুদ্ধ পরিচালনার দক্ষতার কিছু প্রকাশ ঘটেছে এবারের গাজায় হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে (২০২১ খ্রি.)। হামাস ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট হামলা করেছে। এতে খরচ মাত্র কয়েকশ ডলার। অপরদিকে হামাসের এই সস্তা রকেট ধ্বংস করতেই ইসরায়েলকে ছুড়তে হয়েছে অতি ব্যয়বহুল আয়রন ডোম মিসাইল। হামাসের রকেট লক্ষ করে ইসরায়েল উন্নত প্রযুক্তির যেসব আয়রন ডোম মিসাইল ছুড়েছে, তার প্রত্যেকটির দাম ৫০ হাজার ডলার করে।

জেরুজালেম ও পশ্চিম-তীরে অবৈধ ইহুদি বসতকারীরা ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তা দখলের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ করছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার তদন্তকারী একটি দল এ মন্তব্য করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দেওয়া ভাষণে অধিকৃত ফিলিস্তিনে নিয়োজিত জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ কর্মকর্তা মাইকেল লিন্ক একথা বলেন। এ কর্মকর্তা আরও বলেন, তাকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তদন্ত কাজে কোনোপ্রকার সহযোগিতা তো করেইনি; বরং তাকে বয়কট করে জাতিসংঘকে অপমান করেছে। তিনি বলেন, 'ইসরায়েলি

Scanned by CamScanner

বাহিনীর সাথে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি দখলে অংশ নিয়ে একই ধরনের যুদ্ধাপরাধ করছে অবৈধ ইহুদি বসতকারীরা।' পূর্ব-জেরুজালেম ও পশ্চিম-তীরে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি দখল করে ৩০০ অবৈধ বসতি নির্মাণ করেছে, যাতে ৬ লাখ ৮০ হাজার ইহুদি বসবাস করছে। ইসরায়েল কাঠামোগত যুদ্ধাপরাধ করে ফিলিস্তিনিদের একের পর এক ভূমি দখল করে যাচ্ছে।

সর্বশেষ (মে, ২০২১ খ্রি.) ইসরায়েলি আক্রমণ সম্পর্কে জেরুজালেম ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড সিকিউরিটির গবেষক ড. স্পায়ার বলেন, 'চলতি এ সংঘাতে রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে হামাস।' অনেকেই মনে করেন এই সংঘাত হামাসকে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। হামাস দেখিয়েছে প্রতিরোধই কার্যকর।

হামাস একটি সংগঠন আর ইসরায়েল অতি আধুনিক প্রতিরক্ষা সংবলিত, প্রযুক্তিতে সজ্জিত একটি রাষ্ট্র। একটি রাজনৈতিক সংস্থার বিরুদ্ধে আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের কার্যকারিতা, সফলতা আর গাজায় নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে হত্যা একটি দেশের সার্বিক পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র ইরানের সহায়তায় হামাস যতটুকু অগ্রসর হয়েছে, আগ্রাসী শক্তির ঘুমকে অশান্তিতে পরিণত করেছে; তা ফিলিস্তিনের জন্য আশার সঞ্চার করেছে। এবার যদিও হামাস অসংখ্য রকেট নিক্ষেপ করেছে, তবুও সেগুলো ছিল আনগাইডেড। ভবিষ্যতে যদি হামাস গাইডেড মিসাইলের অধিকারী হয়, তাহলে তারা ইসরায়েলের সাজানো বাগানগুলোতে কীভাবে আঘাত হানতে পারবে আর দখলদারদের অবস্থা কেমন হবে, তা সহজেই অনুমেয়। হিজবুল্লাহর কাছে ৪০ হাজার থেকে দেড় লক্ষ রকেট রয়েছে, যা বিশ্বের অনেক উন্নত আর্মির কাছেও নেই। তাদের রয়েছে হাজার হাজার এন্টি এয়ার ক্রাফট, এন্টি শিপ এবং এন্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল। অনেক আর্মি বিশ্লেষকের মতে, অনেক অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী আরব দেশের আর্মি হিজবুল্লাহর মতোও শক্তিশালী নয়। ইরানের সহায়তায় হিজবুল্লাহর কাছে এসব গাইডেড মিসাইল রয়েছে। যদি ইসরায়েল কখনও হিজবুল্লাহর পেছনে লাগে, তাহলে তাদের জন্য ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন অপেক্ষা করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ।

বিশ্লেষকগণ মনে করেন, হামাস উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়তে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে অবৈধ এই জায়নবাদী রাষ্ট্রটির নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনকে রক্ষা করতে পারবে তারা। ইজ্জাদ্দিন কাসসাম ব্রিগেডের ৫০,০০০ যোদ্ধা (যার মধ্যে ৩০,০০০ নিয়মিত) রয়েছে। সংখ্যাটা আরো বেশি হতে পারে। হয়তোবা হামাসের অস্ত্র ইসরায়েলের মতো অত উন্নত নয়; তবে তারা ঈমানের বলে বলীয়ান এবং দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই পরবর্তীতে গাজায় পাল্টা আঘাত হানতে ইসরায়েলকে বার কয়েক ভাবতে হবে।

হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়া বলেছেন, 'ইসরায়েলের আগ্রাসনের মুখে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তার সংগঠনের যোদ্ধারা।' তিনি বলেন, 'দখলদার ইসরায়েল সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হামাস যোদ্ধারা দৃঢ়চেতা অবস্থানে রয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'দখলদার ইসরায়েল সরকার যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে তার ঘৃণ্য অপরাধযজ্ঞ বন্ধ না করবে এবং পবিত্র জেরুজালেম, আল-কুদস্ শহর ও আল আকসা মসজিদের ওপর দখলদারিত্বের অবসান না ঘটাবে, ততদিন পর্যন্ত হামাস যোদ্ধারা প্রতিরোধ লড়াই অব্যাহত রাখার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েল তার আগ্রাসন এবং সহিংসতা অব্যাহত রাখবে, ততদিন পর্যন্ত তার জবাব দেওয়ার অধিকার রাখে ফিলিস্তিনিরা। ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষার অধিকার হামাসের রয়েছে।'

আরব রাষ্ট্রসমূহের বালখিল্যতা, গাজার মানবিক সংকট এবং ফাতাহ্ নেতাদের স্বার্থবাদী কার্যক্রমে নিপীড়িত গাজাবাসীর আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে হামাস। হামাসকে আর্থিক এবং সামরিকভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারলেই হামাসই হবে আগামী দিনের ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আশ্রয়স্থল। হামাস রকেট নির্মাণ অব্যাহত রাখুক। আর কাসসাম ব্রিগেডও তৈরি করুক নিজেদের মতো করে রকেট, রকেট লঞ্চার এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র।

হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা ও শক্তিশালী সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠস্বর শেখ আহ্মাদ ইয়াসিনের ভাষায় বলি, 'ইসরায়েলের জন্মই হয়েছে অবৈধভাবে এবং পুরো ফিলিস্তিনের প্রতিটি ইঞ্চি জমিই মুসলমানদের। এ পথ (জিহাদের) আমরা বেছে নিয়েছি, যার শেষ শাহাদত বা বিজয়ের মাধ্যমেই চূড়ান্ত হতে পারে। ইসরায়েলকে বিশ্বমানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে হবে। আমি বলছি ইসরায়েল শেষ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আগামী শতাব্দীর

Scanned by CamScanner

শুরুর অংশে এটা ঘটবে। আগামী শতাব্দীর শুরুর অংশে ঘটবে– আমি নিশ্চতভাবেই বলছি এটা। ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের ভেতরে ইসরায়েলের অস্তিত্ব মুছে যাবে। কারণ, আমি কুরআনের ওপর ঈমান রাখি। আর কুরআন বলছে, প্রতি ৪০ বছরে প্রজন্মের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। ইসরায়েলের দখলদারিত্বের প্রথম চল্লিশে আমাদের নাকাবা (বিপর্যয়) সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় চল্লিশে হয়েছিল সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রতিবাদ, যুদ্ধ, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি। তৃতীয় চল্লিশে আল্লাহ চাহে তো এটার পরিসমাপ্তি ঘটবে। এটা কুরআনের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করার দ্বারা বুঝে আসে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলের জন্য অবধারিত করেছিলেন– তারা ৪০ বছর সীনা প্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাবে। যাতে করে এই সময়ের মধ্যে পরিশ্রান্ত, অসুস্থ প্রজন্মের পরিবর্তে যোদ্ধা প্রজন্ম গড়ে ওঠে। আমাদেরও প্রথম প্রজন্ম নাকাবাতেই ক্ষান্ত ছিল। পরবর্তীতে পাথর প্রজন্ম ও হাতবোমার প্রজন্ম তৈরি হয়েছিল। সামনে যে প্রজন্ম আসবে, তারা হবে স্বাধীনতা প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ্।'

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিন ও হামাস

এক রক্তাক্ত উপাখ্যান

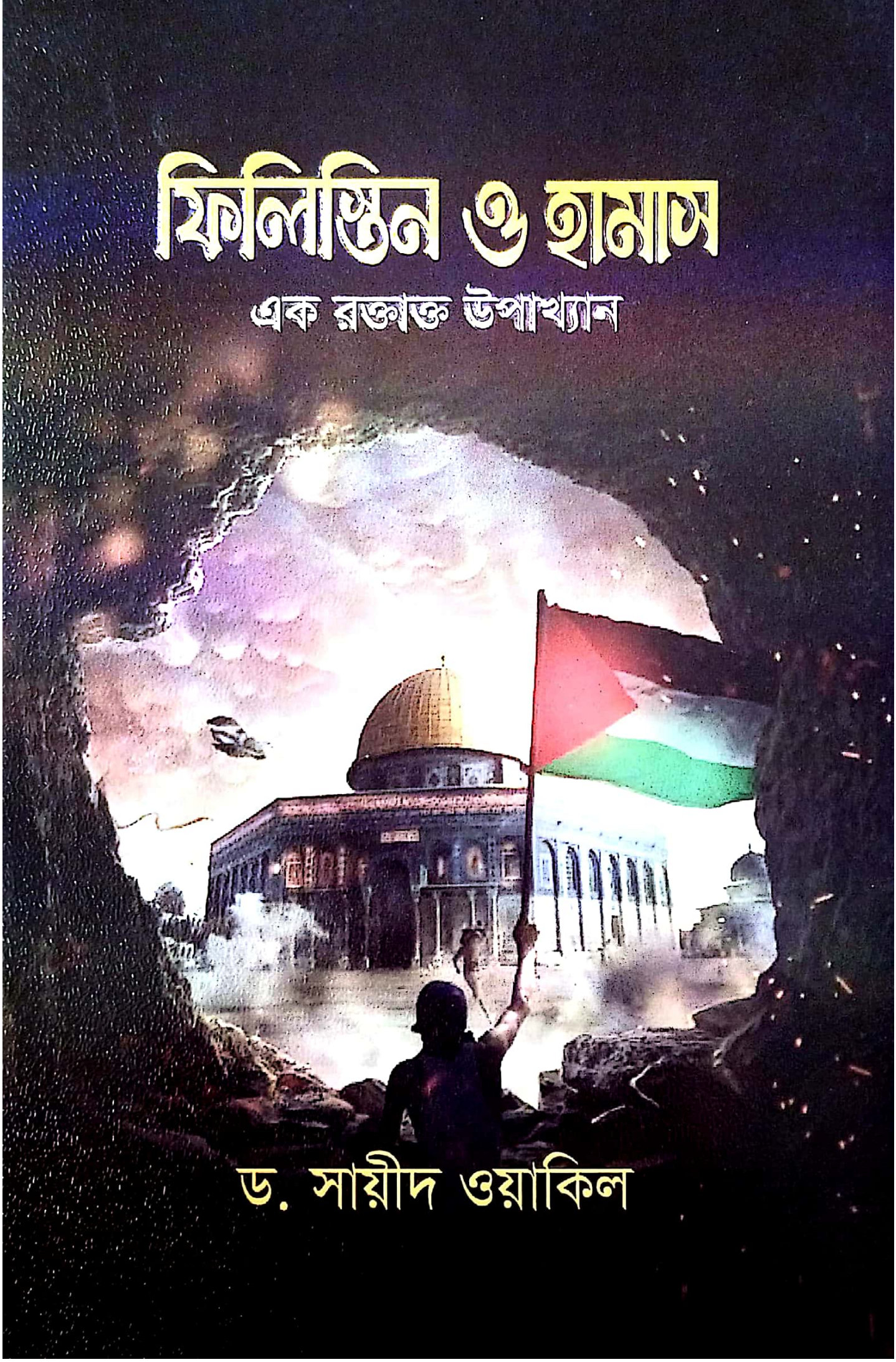

ড. সায়ীদ ওয়াকিল

Scanned by CamScanner